সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদী তত্ত্বের আলোচনা কর।
অথবা, অস্টিনের চরম, চূড়ান্ত, অভ্রান্ত, সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের ধারনাকে বহুত্ববাদীরা কি ভাবে আলোচনা

উত্তরঃ ঊনিবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে একশ্রেনীর চিন্তবিদ্ সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে কেন্দ্রীভূত ও আইনগত দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করেন। বোঁদা, হবস, বেন্থাম, অস্টিন প্রমূখ দার্শনিকেরা রাষ্ট্রের অসীম, অবাধ, ও চূড়ান্ত ক্ষমতার বিরুদ্ধে বহুত্ববাদী দারণার উদ্ভব ঘটে। বহুত্ববাদ হল একাত্ববাদের কেন্দ্রীভূত, সর্বাত্মক ও অবাধ রাষ্ট্রকতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়ার ফল। বহুত্ববাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লাস্কি, বার্কার, লিন্ডসে।

বহুত্ববাদীদের মতে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা চরম ও অবাধ নয়, সমাজে অন্যান্য সংগঠন সমূহ রাষ্ট্রের মতই স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ন। রাষ্ট্রের মতো আরাও সার্বভৌ। একাত্মবাদীদের বক্তব্যকে তিনটি স্বতন্দ্র্য দৃষ্টিকোন থেকে বহুত্ববাদীরা সমর্থন করেছেন। এগুলিহল-

ক. সমাজের সংঘ সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে।

খ. আইনের পরিপ্রেক্ষিতে।

গ. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্ররিপ্রেক্ষিতে।

ক. বহুত্ববাদীদের মতানুসারে আধুনিক সমাজের যুক্তরাষ্ট্রিয় কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংঘের মধ্যে বন্টিতত হওয়া দরকার। সমাজে রাষ্ট্র একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান কিন্তু একমাত্র প্রতিষ্ঠান নয়।

ক. মানুসের সমাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় প্রয়োজন পূরনের তাগিদে সমাজের বিভিন্ন সংঘ ও সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রের ন্যায় এদের উপযোগীতাও অনস্বীকার্য। এই সংঘ সমূহের প্রত্যেকটির স্বতন্দ্র্য স্বাধীন সত্ত্বা আছে।

খ. ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘ গুলির সীমানা ছড়িয়ে আছে। বর্তমানে এদের সংখ্যাও বহু পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্কার তাই বলেছেন আমরা ব্যাক্তি বনাম রাষ্ট্রের কথা না লিখে রাষ্ট্রে বনাম সংঘের কথা লিখে থাকি।

গ. ক্ষমতা কার্যের অনুপাতিক হবে এই কথা স্বীকার করলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হবে। কারন রাষ্ট্র অসীম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। সামাজিক সংগঠন গুলিও তাদের কার্যাবলী বিভিন্ন সীমার মধ্রে আবদ্ধ থাকে।

ঘ. একাত্ববাদীগণ বিবেকের গুরুত্বকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রের প্রতি চরম আনুগত্য বজায রেখেও অন্যান্য সংগঠন গুলির প্রতিও অনুগত্য স্বীকার করার কথা বলেছেন।

অ) বহুত্ববাদীগনের মতানুসারে রাষ্ট্রের আইন সার্বভৌমের আদেশ নয় এবং রাষ্ট্র আইনের স্রষ্টা নয়। আইন হল এক ধরনের সমাজিক নিয়ম কানুন। সমাজের মানুষের সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্র সৃষ্টির বহুপূর্বে আইনের উৎপত্তি হয়েছে।

আ) শাস্তির ভয়ে মানুষ আইন মান্য করে চলে। একাত্ববাদীদের এই যুক্তি বহুত্ববাদিরা মানেন না। তাদের মতানুসারে আইনর উপযোগতিা উপলব্ধি, আইনের প্রতি মানুষের আনুগত্য প্রদর্শনের এক চরম ভিত্তি।

১। বহুত্ববাদীগনের মতানুসারে রাষ্ট্রের সর্বোময় কর্তৃক অভ্যন্তরীন ও উভয়ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তাদের অসীম ক্ষমতার অবাধ প্রয়োগ করলে বিশ্ব শান্তি নষ্ট হয়।

২। বর্তমান বিশ্বে কোন রাষ্ট্র স্বয়ং সম্পূর্ন নয়। একে আপরের ওপর বি্ভিন্ন ভাবে নির্ভরশীল। বর্তমানে তাই একাত্ববাদীদের অনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রিয় সার্বোভৌমিকাতার এবং জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক আদেশে অনুপ্রনিত রাষ্ট্রের কথা বলা হয়ে থাকে।

৩। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠন যেমন অসিয়ান সার্ক এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন রাষ্ট্রসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার প্রভৃতি সংগঠন গুলির নীতির সাথে দেশীয় নীতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে জড়িত।

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদীদের বক্তব্য বহুলাংশে সত্য হলেও পুরোপুরি এটি মুক্ত নয়। বহুত্ববাদীত্বের নিবলিখিত যুক্তি গুলি হলঃ

বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা এবং রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যকে বিভক্ত করে আরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির পথকে প্রশস্ত করেছে। এর ফলে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

বহুত্ববাদীগন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা আইনগত নৈতিক ধারনার মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। সার্বভৌম ক্ষমতার ওপর সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রর্ভতি সংগঠন গুলির নীতির সাথে দেশীয় নীতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত।

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদীদে বক্তব্য বহুলাংশে বহুত্ব সত্য হলেও পুরোপুরি ত্রুটি মুক্ত নয়।

বহুত্ববাদীতত্ত্বের বিরুদ্ধে নিব লিখিত যুক্ত গুলি হল ঃ-

বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা, এবং রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যকে বিভক্ত করে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির পথকে প্রশস্ত করেছে। এর ফলে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হওয়ার আশাঙ্খা দেখা দেয়।

বহুত্ববাদীগণ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা আইনগত নৈতিক ধারনার মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। সার্বভৌমিক ক্ষমতার উপর সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলির আধিকার হল প্রকৃতপক্ষে নৈতিক আথিকার, আইনগত অবিচার নয়। বহুত্ববাদী দার্শনিকরা এই পার্থক্য অনুধাবন করতে পরেননি।

বহুত্ববাদীদের আইন সম্পর্কিত ধারনানিও ত্রুটি মুক্ত নয়। আইনের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক ন্যায় বিচার ও ব্যাক্তির ভালমন্দের কতা বলে থাকেন। এই সব করনেই আইন সম্পর্কিত বহুত্ববাদের ধারণাটি ত্রুটি মুক্ত নয়। আইনের উৎস হিসাবে বিবেকের অনুশাসনের কথা বলে এবং এই আইনের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক ন্যায় বিচার ও ব্যক্তির ভালমন্দের কথা থাকেন। এই সব কারনেই আইন সম্পর্কিত বহুত্ববাদের ধারনাটি অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট।

বর্তমান আন্তর্জাতিকতাবাদের যুগেও প্রতিটি রাষ্ট্র ও স্বাধীন ও সার্বভৌম শক্তির অধিকরী। এই ক্ষমতাকে অস্বিকার করলে রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

উপরিউক্ত সমালোচনা সত্বেও বহুত্ববাদের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। মানব সমাজ সংঘ মূলক এবং মানব জীবনের সংঘের ভূমিকাও গুরুত্ব

অস্বীকার করা যায় না। সংঘগুলি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের উপযোগি উক্ষো করেননি। বরং সর্বাত্মক ও অবাধ কর্তৃত্ব খর্ব করাকে খাত।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনা কর।

..... বলেছেন যে "....." অর্থাৎ.....বাদল হল একটি বিশ্ববিক্ষ্যা। এই বিশ্ববিক্ষ্যকের প্রবীন নীতিহল- দ্বান্দিক বস্তুবাদ'। ইংরাজি.....এর উদ্ভব গ্রীক শব্দ..... থেকে যার অর্থ বিতর্ক বা প্রাশ্নাত্তরের মাধ্যমে মত্যে উপনীত হওয়া। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক .....তাঁর ভাববাদী তত্ত্ব সর্বপ্রথম দ্বন্দ্বে.....করেছিলেন। কিন্তু .....ও ....তত্ত্বের

প্রশ্নঃ গ্রেট ব্রিটেন "সংসদীয় সার্বভৌমত্বের ধারনাটি আলোচনা কর।

উত্তর ঃ 'গ্রেট ব্রিটেন'- এর সংসদ গঠিত হয় উচ্চকক্ষ "লর্ড সভা" এবং "নিব কক্ষ" কমন্স সভা" এবং "রাজা/রানী" এর সমন্বায়ে। ঐতিহাসিক ভাবে, ব্রিটেনে আইন সভার বিবর্তন ছিল এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া যা উদার গনতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অ্যাংলো স্যাক্সন মুডোর পরামর্শদাতা 'উইটেনেজমট কাউন্সিল' বিবর্তিত হয় অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাবীন্য মুক্ত 'ম্যাগনাম কনসিলাম' এ এবং ১৬৪৮ সালে গৌরবময় বিপ্লব' এর মাধ্যমে রাজা William এবং রানী Mary এর সিংহাসন লাভের পরিবর্তে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে, 'আধিকারের সনদ'(১৬৮৯) এবং Act of settlement (1701)এর মাধ্যমে রাজতন্ত্রের ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে বিপরীত ক্রমে পার্লামেন্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রেট বিটেনের উদারনৈতিক সমতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায়। সুতরাং ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় "শাসন বিভাগ" ও "বিচার বিভাগ" এই দুই প্রবীন বিভাগের তুলনায় আইন-প্রনয়নকারী আইন সভঅর প্রাধান্য অন্যতম তৎপর্যপূর্ন বৈশিষ্ট্য পর্যবসিত হয়েছে, যাকে বলা হয়ঃ "ব্রিটিস সংসদের সার্বভৌমত্ব" !

গ্রেট ব্রিটেন সংসদের সার্বভৌমত্ব বলতে বোঝায় যে, 'আইন সভা-প্রণীত কোন আইন অণ্য কোন উচ্চতর আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়; অথবা, সংসদ-প্রনীত আইনের সাংবিধানিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না। তাঁর "The Law of the constitution" গ্রন্থ A.V. Dicey ব্রিটিস আইন সভার সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে মত প্রদান করেছেন যে- "The principle of parliamentary sovereigntymeans...that perliament thus defined has, under the english constitution, the lihgt to make or unmake anylaw whatever;" অর্থাৎ সংসদীয় সার্বভৌমিকাতার মুখ অর্থ হল এই যে, ব্রিটেনে আইন বিভাগ তার ইচ্ছা অনুযায়ী আইন রচনার ক্ষমতার অধিকরী ও এই অধিকার প্রশ্নাতীত। Dicey এক্ষেত্রে সর্বোভৌমত্বের ধারনাটিকে সম্প্রসারিত করে দেখিয়েছেন যে সংসদের সার্বভৌমত্বের আরও দু'টি ক্ষমতাকে প্রকাশ করেঃ

ক. ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পূর্ববর্তী যে কোন আইনকেও সংস্কার, পরিমার্জন বা বাতিল করতে পারে।

খ. ব্রিটিশ সংসদ "শাসনতন্ত্র" কেও (অলিখিত) সংশোধন করতে সমর্থ্য !

গ্রেট ব্রিটেনের সংসদীয় সার্বভৌমত্বের আলোচনায় তিনটি বিষয় বিশেষ প্রনিধানযোগ্যঃ

প্রথমত, ব্রিটেনের সংবিধান "অলিখিত" তাই, সংসদ যে কোন বিষয়ে আইন প্রনয়ন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত যেহেত, গ্রেট ব্রিটেন মুক্তরাষ্ট্র নয়,বরং " এককেন্দ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা," তাই অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে, আইন প্রনয়নের কোন সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা/ কর্তপক্ষ পার্লামেন্টে নেই এবং তৃতীয়ত ব্রিটিস সংসদের সার্বভৌমত্ব হল, বস্তুপক্ষে, কমন্সসভার সার্বভৌমত্ব। তাছাড়া, ব্রিটেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর মতো "সংসদীয় আইন" "সাংবিধানিক আইন" এর বিরোধী হলেও বাতিল হয়ে যায় না। এমনকী, এই সার্বভৌমত্ব "রাজা/ রানীর ডোমিনিয়ন" গুলির ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য!

মার্কিন বিচার বিভাগ এর মতো ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার "বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা" এর ক্ষমতা নেই (Power of Judiceal Review) ব্রিটিশ আদালত তাই সংসদ প্রনীত আইনের বৈধতা ও সাংবিধানিকতা বিচারে অপারগ। ব্রিটিশ সংসদ রচিত আইনকে আদালত কেবল ব্যাখ্যা করতে পারে; এমনকী আদালতের সিদ্ধান্ত নাকচ করার ক্ষমতাও পার্লামেন্টের রয়েছে। ব্রিটেনে সংসদীয় আধিপত্যের এটি একটি মুখ্য করন ! অনুরূপে শাষণ বিভাগেও সংসদের আইন প্রনয়নের ক্ষমতার উপর বাধা আরোপ করতে পারে না। করন রাজ/রানী হলেন ".....প্রবীন" সংসদ প্রনীত কোন Bill এ Veto প্রয়েগের ক্ষমতা তাদের অধিকার বহির্ভূত। আবার পয়োজনে তার কর্মকালের হ্রাস বা বৃদ্ধি ও করত পারে ব্রিটিশ সংসদ। যেমন ১৯১৪ সালে "সংসদ আইনে'-এ পার্লামেন্টের কর্মকাল দুই বছর বৃদ্ধি করেছিল স্বয়ং পার্লামেন্ট। এছাড়া, "দন্ডনিস্কৃতি আইন" অনুসারে, ব্রিটিশ পার্লমেন্ট অতীতে কৃত অবৈধ কার্মাবলীকে বৈধতার স্বীকৃতি প্রদান করতে পারে। যুদ্ধ কালীন অবস্থায় শাষন বিভাগের অবৈধ ভূমিকাকে বৈধ ঘোষণা করতে পারে সংসদ। সুতরাং, পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব বলে একমাত্র পুরষাকে নারীতে ও নারীকে পুরয়ে রূপান্ত রিত করা ব্যতীত সংসদ অন্য সবকিছুই করতে পারে। মার্কিন "কংগ্রেস" এর ক্ষমতা "শৃঙ্খলিত .....' এর কারণ, মার্কিন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি চালিত। ফরাসী পার্লামেন্ট শাসন বিভাগের দ্বারা এবং "অর্পিত ক্ষমতার আইন" এর দ্বরা সীমিত। অর্থাৎ মার্কিন ও ফরাসী আইন সভার তুলনায় "ব্রিটিশ সংসদ" এর ক্ষমতা সার্বভৌমত্ব অধিকতর।

১। আইনানুগ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সংসদের অধিপত্য অবাধ; কিন্ত, বিশ্বের প্রচীনতম গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে সরকারের কোন একটি বিভাগের স্বৈরচারী প্রবণতা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ইংল্যান্ডের সাবেকী রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে যে সংসদীয় গনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল সেখানে পার্লমেন্টই স্বেচ্ছাচারী; ফলে, সাংবিধানিক ও বাস্তবভাবে, ব্রিটিশ সংসদের উপর একধিক বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে।

১। "আন্তর্জাতিক আইন"-এর পরিপন্থী কোন আইন সংসদ প্রনয়ন করতে পারে না।

২। কোন "ডেলিনিয়ন" এর অমতে সংসদ আইন রচনাকরতে পারে না;

৩। গ্রেট ব্রিটেনের সুদীর্ঘ রীতিনীতি,সংস্কৃতি ও উদারনৈতিক আদর্শকে উপেক্ষা করে সংসদ আইন প্রণয়নে অক্ষম;

৪। "ইউরোপীয় ইউনিয়ন"- এর সদস্য হিসাবে ইউনিয়নের সাবভৌমত্ব বৃটেন রাষ্ট্রের সংসদের সার্বভৌমত্ব অপেক্ষা আধিকতার

শক্তিশালী !

এবং ৫। ব্রিটিশ নাগরিকদের 'রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব' দ্বারা "সংসদের সার্বভৌমত্ব" সীমিত।

সার্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট যে, ব্রিটেনে সংসদের সার্বভৌমত্ব তাত্ত্বিকভাবে নিরঙ্কুশ হলেও, বাস্তবে তা সীমিত। এই সর্বভৌমত্বের প্রধান্য এককেন্দ্রিক শাষন ব্যবস্থা ও ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল। কিন্তু "আঞ্চলিকতাবাদী প্রবনতা" ও "বিশ্বায়ন" এর নেতিবাচক প্রভাবে ও 'জনমত' এর প্রভাবে এই সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয়েছে। কিন্তু, "তুলনামূলক রাজনীতি" এর আলোচনায় 'সংসদ'-রূপী কাঠামো' (Structures) কে বুঝতে তুলনা করতে 'ব্রিটিশ সংসদের সার্বভৌমত্বর ধারনা' অন্যন্ত গুরুত্বপূর্ন !

উত্তরের গঠন ঃ ভূমিকা Dicey এর সার্বভৌমত্ব সংক্রন্ত মত- সংসদের সার্বভৌমত্বের আইনগত কারণ বিচার বিভাগীয় কারণ অন্যান্য কারনসমূহ সংসদের সার্বভৌমত্বের সীমাবদ্ধতা- উপসংহার।

প্রশ্নঃ ব্রিটেনের কমন্স সভা ও মর্কিন প্রতিনিধি সভঅর তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তরঃ ভূমিকাঃ মার্কিন আইনসভাকে সংগ্রেস বলা হয় এবং কংগ্রেসের নিবকক্ষ হর প্রতিনিধিসভা। ব্রিটেনের আইনসভার নিবকক্ষ হল কমন্সসভা। মর্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন হল উদারনৈতিক দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত দুটি বৃহৎ উদারনীতিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভার দুটি নিবকক্ষের মধ্যে সাদৃস্যও কম নয়।

সাদৃশ্য ঃ মার্কিন প্রতিনিধিসভা ও ব্রিটিশ কমন্সসভার মধ্যে সাদৃম্যগুলি হল-

১। প্রতিনিধিসভা ও কমন্সসভা উভয়ই সংস্থাই হল নিজ শাসন ব্যবস্থার আইসভার নিবকক্ষ।

২। কমন্সসভা ও প্রতিনিধি সভা- উভয় সংস্থার সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে জনগবী দ্বারা নির্বাচিত হন।

৩। উভয় শাসন ব্যবস্থায় এই সংস্থায় দুটি সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা বোগ করে। উভয় শাসনে ব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব সংস্থা দু'টি অনুমোদন ছাড়া কার্যকর হয় না।

৪। উভয় সংস্থাই বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে তাদের কাজ কর্মের পরিচালনা করা।

৫। উভয় সংস্থাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সমূহের ওপর আলোচনা ও বিতর্কের ক্ষেত্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ন

প্রশ্নঃ ভরতীয় সংসদের কমিটির ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তরঃ ভারত হল বিশ্বের বৃহত্তম "সংসদীয় গনতন্ত্র"; ভারতীয় আইন সভা তাই এই গনতন্ত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে । সংসদের এই ভূমিকা সম্পাদিত হয় সংসদীয় পদ্ধতিসমূহকে কার্যকর করার মাধ্যমে । আইন সভা এর প্রধান ভূমিকা হয় গনতান্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত ও ফলপ্রসু আইন প্রণযন করা । এই উদ্দেশ্যে কোন 'বিল' () ভারতীয় সংসদে উপস্থাপিত হয়ে সেটিকে সঠিক ও অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ ও মূল্যয়ন করা , পরিক্ষা করা ও সবিস্তারে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী । বর্তমানে ভারতীয় সংসদের 'উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা' এর সদস্যসংখ্যা ২৪৫ জন এবং ' নিবকক্ষ লোকসভা' এর সদস্যসংখ্যা ৫৫২ জন । সুতারাং , বৃহৎ আয়তন সংসদে কোন প্রয়োজনীয় 'বিল' সম্পর্কে পরিক্ষা করা সহজসাধ্য নয় , সময়ের অভাবও যথেষ্ঠ । তাছাড়া শাসন ব্যবস্থা ও নাগরিক কল্যানের জন্য বিষয়টিকে আলোচনা ও বিবেচনা করার যথোপযুক্ত বিশেষস্থ দক্ষতা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সংসদের অধিকাংশ সদস্যের থাকে না । তাই বিশ্বের প্রায় সব গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মতোই ভারতের সংসদেও ' কমিটি ব্যবস্থা ' () গঠিত হয়েছে এই সমস্যার নিরসনের লক্ষ্যে ।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ' কেন্দ্র ' ও 'প্রাদেশিক আইন সভাগুলি' তে 'কমিটি ব্যবস্থা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠেছে । এক্ষেত্রে , উল্লেখ্য যে , ভারতের কমিটি ব্যবস্থা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং তাই এই ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি - শাসিত ব্যবস্থায় উদ্ভূত ' কমিটি ব্যকস্থা' এর মতো শক্তিশালি নয় । ভারতের কেন্দ্রীয় 'আইন সভা ' -তে সৃষ্টি কমিটি কোন প্রস্তাবিত বিল বিচার-বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনা - সহকারে সংশ্লিষ্ট বিলটিকে সংসদে প্রেরণ করে কমিটি এবং এই পরিশিলন ও সুপারিশগুলিকে পর্যালোচনা করে বিলটিকে পাশ করে । ভারতীয় পার্লামেন্টে এই কমিটিকে বলা হয় ' সিলেক্ট কমিটি' () । আবার , আইন সভার অন্যান্য গনতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনেরও এই কমিটি বা কমিটিগুলি সংসদকে সাহায্য করে । অর্থাৎ ' কমিটি ব্যবস্থা' ভারতীয় সংসদের গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিনত হয়ে উঠেছে । ভারতের আইন সভার পদ্ধতি ও চর্চাতে কোন বিলকে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয় যদি ওই বিলটিকে কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব সংসদে গৃহীত হয় । সিরেক্ট কমিটি আইন প্রণয়ন- এর ক্ষেত্রে চরম ক্ষমতার অধিকারী নয় । কারন , বিবেচনার জন্য প্রেরিত বিল -এর নীতি সম্পর্কে কোন আলোচনা করার বা এই বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রদানের ক্ষমতা কমিটি ভোগ করে না । তবে, সিলেক্ট কমিটির কিছু বিশেষ অধিকার ভোগ করে ।

১। কমিটি যে কোন ব্যক্তিকে তার সামনে উপস্থিত হতে বাধ্য করতে পাবে ।

২। কমিটি প্রয়োজনীয় যে কোন ' নথি' তার কাছে পেশ করতে বাধ্য করতে পাবে ।

৩। কমিটির সদস্য নন এমন ব্যক্তিকেও কমিটি তার সভায় উপস্থিত করতে পাবে , এক্ষেত্রে এই ব্যক্তির কমিটির আলোচনায় অংশ গ্রহনের বা ভোটদানের কোন অধিকার থাকে না ।

৪। কমিটির সভাপতি হন লোকসভার 'স্পিকার ' এবং তিনিই সিলেক্ট কমিটির ' প্রধান'-কে নির্বাচন করে ।

৫।কমিটি তার সুপারিশ ও পরিশীলনগুলি ' ' এ আইন সভাতে প্রেরণ করে ।

কেন্দ্রিয় আইন সভায় ' সিলেক্ট কমিটি' ব্যতীত আরও একাধিক কমিটি গঠিত ও সক্রিয় থাকে । এই কমিটি ব্যবস্থার শ্রেনীকরণ করা যায় , যেগুলিকে বলা হয় ' স্ট্যান্ডিং কমিটি '।

স্ট্যান্ডিং কমিটি

১। বিশেষাধিকার কমিটি () ঃ- পনেরো জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয় ও ' লোকসভার অধ্যক্ষ' এই সদস্যদের নির্বাচিত করেন ।সদস্যদের ' বিশেষ অধিকার ' ভাঙ্গর ঘটনা বিচার করা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা এই কমিটির মুখ্য দায়িত্ব ।

২। নিয়ম সংক্রান্ত কমিটি ও স্পীকার ()ঃ- পনেরো জন সদস্যকে সহ গঠন করেন । এই কমিটির ' সভাপতিত্ব' করেন অধ্যক্ষ স্বয়ং । এই কমিটির সংসদের কার্য পরিচালনার নিয়ম পরিক্ষা করে ও সুপারিশ করে ।

৩। সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি ()ঃ 'লোকসভার অধ্যক্ষ' পনেরো জন সংসদ-সদস্যকে নিয়ে গঠন করেন । আইন সভার মন্ত্রিরা যে সব অঙ্কীকার করেন বা সংকল্প ঘোষনা করেন, সেগুলি কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে সে সম্পর্কে সমীক্ষা করে এই কমিটি ।

৪। পরামর্শদাতা কমিটি()ঃ- পনেরো জন সংসদ-সদস্যযুক্ত ও ' সভাপতিত্ব ' করেন অধ্যক্ষ । সংসদের কার্যবলী সম্পর্কে কর্মসূচি প্রণয়ন করা ও সংসদে আলোচনার জন্য বরাদ্দ করা হবে । সেই বিষয়ে মতামত প্রদান করা এই কমিটির প্রধান কাজ ।

৫। ' বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত যৌথ কমিটি' ()ঃ- এর সদস্যসংখ্যা পনেরো জন । এই পনেরো জন সদস্যদের মধ্যে ১০ জন কে নিয়োগ করেন স্পীকার এবং ৫জন কে নিয়ে 'রাজ্যসভা' -এর সভাপতি । সংসদ - সদস্যদের বেতন , ভাতা , ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত নিয়ম-নীতি ও প্রস্তাব করে এই কমিটি ।

খ) ১। সরকারী হিসাব পরিক্ষা কমিটি() ঃ- ভারতীয় আইন সভার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি কমিটি । রাজ্যসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ৭ জন ও লোকসভা সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ১৫ জন সদস্য , মোট ২২ জন সদস্যকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয় । প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের ' সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি' -এর মাধ্যমে এই কমিটিতে সদস্যরা নিযুক্ত হন । ভারতীয় সংসদের রীতিনীতি অনুযায়ী বিরোধী দলের কোন সদস্যই এই কমিটির ' সভাপতিত্ব করনে ।

এই কমিটির মুল দায়িত্ব হল ' রাষ্ট্রপতির দ্বারা প্রেরিত ভারতের 'অডিটার ও কম্পট্রোলার জেনারেল' - এর বার্ষিক রিপোর্টকে সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা । সরকারী হিসাব সমীক্ষা কমিটির প্রধানত ঃ এই প্রক্রিয়ায় সরকারের আয়-ব্যয়ের উপর তদারকি করে । তহি, কোন মন্ত্রী এই কমিটির সদস্য হতে পারে না ।

২। আনুমানিক হিসাব কমিটি () ঃ- ৩০ জন সদস্য সহ গঠিত হয় যারা সকলেই 'সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি' এর মাধ্যমে লোকসভা থেকে নির্বাচিত হন । এই কমিটিতেও মন্ত্রীরা সদস্য হতে পারেন না । প্রত্যেক বছর ' বাজেট' এ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য যে সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রস্তাব থাকে, তাকে পরিক্ষা করে উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচনের উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করাই হয় এই কমিটির মুখ্য কাজ ।

৩। সরকারী উদ্যেগ বিষয়ক কমিটি ()ঃ- গঠিত হয় রাজ্যসভার থেকে আগত ৫ জন ও লোকসভা থেকে আগত ১০ জন সদস্যের সমাহার । এক্ষেত্রেও মন্ত্রীরা এই কমিটির সদস্য হতে পারে না এবং ' সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি ' গৃহিত হয় । লোকসভা থেকে আগত সদস্যদের মধ্যে একজন এই কমিটিতে ' সভাপতিত্ব ' করে ।

সরকারী উদ্যেগের ভূমিকা পর্যবেক্ষন ও অনুসন্ধান করা ও সেগুলি সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কী না , সে বিষয়ে মুল্যয়ন করে এই কমিটি ।

সংসদের দুই প্রকারের প্রধান কমিটি ' সিলেক্ট ও স্ট্যান্ডিং কমিটি ' ব্যতীতও আর এক প্রকারের গুরুত্বপূর্ন কমিটি থাকে , যেগুলি প্রয়োজন ভিত্তিক বিশেষ কার্যের জন্য গঠিত হয় , এই কমিটি গুলিকে বলা হয় () স্পীকার বা লোকসভার সদস্যরা এই প্রকারের কমিটি গঠন করে । বস্তুত, প্রয়োজনীয় কাজ শেষ হয়ে গেলে এই কমিটিগুলিও বিলুপ্ত হয়ে যায় ।

সংসদের কমিটি ব্যবস্থার কার্যবলী প্রকাশ্য নয় , এর কোন 'জনশুননি' হয় না । উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের ভোটে মাত্র একবারের জন্য কমিটিতে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় । ভারতে অর্থ অনুসন্ধান সমীক্ষা ,পরিসেবা সংক্রান্ত কমিটি , বিভাজিয় কমিটি ,কক্ষ কমিটি - ভারতীয় সংসদের গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশে পরিনত হয়েছে । ১৯৮৯ সালের পর কমিটির সংখ্যা ও কার্যাবলী বহুলাংশে বৃদ্ধি পেযেছে । ফলে , সংসদের গনতান্ত্রিক ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ।

প্রশ্নঃ- রাজনীতির বিষয় হিসাবে পরিবেশবাদ আলোচনা কর । ভারতের পরিবেষবাদী আন্দোলন সম্পর্কে একটি টিকা লেখ ।

বা, Environmentalison as a subject-matter of politics.

উঃ- ইংরাজি 'এনভাইরোমেন্ট' (Environment) শব্দটির উদ্ভব ফরাসী শব্দ 'এনভিরোনির'(Environir) শব্দটির থেকে যার অর্থ 'ঘিরে থাকা' । বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যেই ' মানব প্রজাতি' ও মানব সমাজের অবস্থান ; মাণবিক ও সামাজিক বিন্যাস ও এই বিন্যাসের বিকাশ ঘটে পরিবেশের মধ্যে । প্রকৃত স্বয়ং-সম্পূর্ন এবং নিজস্ব সত্তার অধিকারী; পরিবেশ একটি 'আইডেনটিটি- ইন-ইটসেল্ফ (Identity-in-Itself) মানুষ ও মানব সমাজ কেবলমাত্র এই ব্যাপক,সার্বজনীন পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ন অংশমাত্র ।

'পরিবেশ' রাজনীতির বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে শুরু করে বিগত শতাব্দী দ্বিতীয় দশক থেকে , মুলতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী পূর্বে । মানবিক সক্রীয়তা কীভাবে পরিবেশকে প্রভাবিত করে ও পরিবেশর সঙ্গে মানুষের মিথষ্ক্রিয়া পরিবেশ ভিত্তিক রাজনীতি চর্চার কেন্দ্রীয় প্রত্যয় । রাজনীতি মূলতঃ মানবিক ও সামাজিক কর্মধারার প্রকাশ, তাই এটি 'এ্যনথ্রোপো সেন্ট্রিক' (Anthropo-centric) কিন্তু ,পরিবেশ ভিত্তিক রাজনৈতিক ধারনা ' মন-এ্যনথ্যোপো সেন্ট্রিক'(Non-Anthropo-centric) । তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি রাজনীতির প্রচলিত ধারনার তুলনায় ভিন্নমত, স্বতন্ত্র্য ও অভিনব ।

এই পরিবেশ ভিত্তিক রাজনীতি চর্চা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে এক পরিপূর্ন চরিত্রে ও রুপে আত্মপ্রকাশ করে ,যার নামকরন করা হয় ঃ 'পরিবেশবাদ'; কিন্তু পরিবেশবাদ,পরিবেশবাদী রাজনীতির ও আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী উদ্ভবের কারন ছিল -দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতি, পারমানবিক অস্ত্রের ব্যবহার ও সম্প্রসারণ, বিভিন্ন দূষণ, এ্যসিড বৃষ্টি এই বহুতর বাস্তব পরিবেশগত বৈশ্বিক সংকট । যা পৃাথবীর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে ।

এই পরিপেক্ষিতে ওসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক আরনে নায়েস (Arne Naess)পরিবেশবাদ সংক্রান্ত প্রথম তাত্ত্বিক মতামত প্রকাশ করেন বুখারেস্টে ১৯৭২ খ্রীঃ একটি বৃহত্তর ; যেটি পরে প্রকাশিত হয় ' দ্য শ্যালো অ্যান্ড দ্য ডিপ,লঙরেঞ্জ ইকোলজি ক্যাল মুভমেন্ট '(The shallow and the deep,long-Renge Ecological Movement), শীর্ষক প্রবন্ধ হিসাবে । এখানে , নায়েম শ্যালো ও ডিপ ইকোলজির মধ্যে পার্থক্য করে দেখিয়েছেন যে, প্রথমটি হল মানুষের নিছুক স্বার্থ ও আত্মরক্ষার তাগিদে পরিবেশ সচেতনতা ; তাই এটি হল ভ্রান্ত পরিবেশবাদ । কিন্তু,দ্বিতীয়টি হল সমগ্র বায়োস্ফিয়ার সম্পর্কে সচেতনতা,যার একটি অংশ হল মানবতা ।

নায়েম তার বক্তৃতায় দেখিয়েছেন যে পরিবেম হল ভূমন্ডলের সাম্যনীতির বা বায়োস্ফেরিয়াল ইগালিটিরিজমের ধারক ও বাহক ; এর অর্থ হল এই যে সমস্ত জীব প্রজাতির নিজেকে রক্ষার ও বিকাশের সমান অধিকার আছে । তাই মানুষ প্রজাতির হিসাবে জীবজগতের সঙ্গে ঐক্যের খুজে আবদ্ধ । মানব সমাজে যেমন বহুত্ব ও বৈচিত্র্য রয়েছে ও তা স্বীকৃত ,তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জবিবৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও এই নীতি সমানভাবে প্রযোজ্য । মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বলেছেন যে , এই পরিবেশবাদের মূলনীতি হল ' অহিংসা' । ড়

তাঁর এনডাইরনমেন্টালিজম অ্যান্ড পলিটিক্যাল থিয়োরী (১৯৯২){Environmentalism and Political Theory}অ্যান্ড আর এসকারস্‌লে (R.Eskersly) দেখিয়েছেন যে, আমাদের চারপাশের দৃশ্যমান ও অনুভবযোগ্য পরিবেশের মধ্যে সমস্ত কিছুই 'embeded in ecological relations'পরিবেশবাদ তাই 'human community ও non- community'এই দুই সত্তাকেই সমান্বিত করে । সুতারাং পরিবেশবাদ হল একটি সামগ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি, কারণ তা জন সংখ্যা, প্রজাতি, ইকোসিস্টেম এই বিষয়গুলিকে সম্পৃক্ত করে ।

প্রচলিত রাজনৈতিক দর্শণ ও তত্ত্ব 'এ্যনথ্রোপো সেন্টিক'; উপযোগবাদ ,উদারনীতিবাদ,ভাববাদ বা এমন কী সমাজবাদ বা ক্ষমতা,কতৃত্ব,অধিকার,ন্যায়,সাম্য এই যাবতীয় রাজনৈতিক ধারনা- বৈজ্ঞানিক বা অধিবিদ্যামুলক ,বিষয়গত বা বিষয়ীগত, মানুষ ও মানুষের দ্বারা নিমিত সমাজকেই মানদন্ড হিসাবে ধরেছে ।ফলে উন্নয়ন -শিল্পয়ন- আধুনিকরন নষ্ট হয়েছে ।মানবকেন্দ্রিক উৎপাদন ও রাষ্ট্রে ও রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রযুক্তি বিপন্ন করেছে জীববৈচিত্র্যকে । প্রকৃতি তার ধারন-বহন ও সংরক্ষন ক্ষমতা হারাচ্ছে ও ফলে সুত্রার দ্বিতীয় পিঠ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মানুষের ভবিষ্যৎ ও ভাবী প্রজন্ম ।

পরিশেষে বলা যায় যে, মার্কসীয় তাত্ত্বিক আনটোনিও গ্রামসি দেখিয়েছেন যে, যেহেতু রাজনীতি হল হেজেমনি অর্থাৎ আধিপত্যই হল রাজনীতির অধিব্যক্তি, তাই(everyting is politics); তাই প্রকৃতির উপর মানুষের অধিপত্য স্বয়ং এক ধরনের রাজনীতি; ও এই সুত্রে নিঃসন্দেহে পরিবেশবাদ একটি রাজনৈতিক বিষয় ।

প্রশ্ন ঃ ভারতে পরিবেশবাদী আন্দোলন ।

উঃ - ১৯৯০ এর দশকের একটি গুরুত্বপূর্ন রাজনৈতিক অবদান হল New social Movements এর উদ্ভব যার পরিপূর্ন বিকাশ ঘটে ১৯৯০ এর পরবর্তী সময়ে সমগ্র বিশ্বব্যাপী । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এই আন্দোলনে তৃতীয় বিশ্বে বিভিন্ন রুপে ভ্রন অবস্থায় ছিল ; এই রুপগুলির মধ্যে ১৯৭০ থেকে নতুন সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে যে মাত্রাটি ভারতে সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও বিতর্কিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সেটি হল 'পরিবেশ আন্দোলন' । ভারতীয় জনসমাজ ও জনমত এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে । ভারতে একাধিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন পরিবেশবাদী সংগঠন গড়ে উঠেছে; এগুলির মধ্যে উল্লেখের দাবী রাখে,যেমন-

জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব এনভাইরনমেন্টাল সাইন্স', ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফর নেচার ইন্ডিয়া, সেন্টার অব ইকোলজিক্যাল সাইন্স, ভূপালের একালব্য বা সেন্টার ফর এনভাইরনমেন্টাল এডুকেশন ইত্যাদি । এছাড়াও, ভারতের পরিবেশবাদী অসংখ্য NGO গুলির মধ্যে একটি সমন্বয়মূলক সর্বভারতীয় সংস্থাও আছে - NAPM বা 'ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব পিপল'স মুভমেন্ট ' ।

ভারতের পরিবেশ আন্দোলনগুলি বহুমাত্রিক; মতাদশগত ও প্রতিবাদের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে এই আন্দোলনের চরিত্রকে একাধিক শ্রেনিতে বিভক্ত করা যায় ।মতাদর্শের সাপেক্ষে ভারতের চার প্রকারের পরিবেশ আন্দোলন সংগঠিত হয় ; এগুলি হল -

১) গান্ধীবাদী আন্দোলন যা বিশ্বাস করে যে প্রাচ্য তথা ভারতীয় জীবনচর্যা হল অ-বস্তবাদী; তাই তারা দরিদ্রায়নের নীতির পক্ষে ও শিল্পায়ন,আধুনিকীকরন, ভোগবাদের বিপক্ষে পরিবেশকে স্থাপন করে ।

২)মার্ক্সবাদী আন্দোলন যা দারিদ্রের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কের ভিত্তিতে আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের পুনঃবন্টনের জন্য দাবী জানায় ।

৩) উপযুক্ত প্রযুক্তিবাদী আন্দোলন যা পরিবেশ ও তার পক্ষে উপযোগী প্রযুক্তির মধ্যে সমন্বয়কে সমর্থন করে ।

৪) অতিউদ্যোমী ব্যক্তিদের আন্দোলন যা জীবজন্তু, বনভূমি ও জৈব-বৈচিত্র্যকে রক্ষায় সচেষ্ট ।

আবার, অন্যদিকে প্রতিবাদের বিষয়বস্তুর সাপেক্ষে ভারতীয় পরিবেশ আন্দোলনকে হর্ষ শেঠি তাঁর সুবিখ্যাত 'সারভাইডাল অব ডেমোক্রেসি ঃ ইকোলজিক্যাল স্ট্রাগেল ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ

১) অরণ্য- অঞ্চল-কেন্দ্রিক আন্দোলন; এর বিষয় হল অরণ্যনীতি,বনজ সম্পদের সঠিক ব্যবহার ।

২) ভূমিকেন্দ্রিক আন্দোলন; এর বিষয় হল শিল্পায়নের ফলে আবাদী জমির পরিমান হ্রাস, খনিজ সম্পদের অপচয়,রাসায়নিকের ব্যবহার ও তার ফলে ভূমিক্ষয় ইত্যাদি ।

৩) বৃহৎ জলাধার বিরোধী আন্দোলন ।

৪) দূষণ বিরোধী আন্দোলন ।

৫) সমুদ্র ও সমুদ্র সম্পদ নির্বিচারে শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন ।

এছাড়াও, বে-সরকারী সংস্থাগুলির উদ্যোগে ও সামাজিকভাবে পরিবেশ আন্দোলন যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে ।যেমন - তেহড়ি গাড়ওয়াল অঞ্চলে পরিবেশ রক্ষার জন্য ধনডাক এর দৃষ্ঠান্ত ।

প্রশ্ন ঃ দ্বান্দিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialisme) ঃ Emile Burns বলেছেন যে Marxism is a general theory of world in which we live and of human society as a part of that world. অর্থাৎ মার্ক্সবাদ হল একটি বিশ্ববীক্ষ্যা । এই বিশ্ববীক্ষ্যার প্রধান নীতি হল 'দ্বান্দিক বস্তুবাদ' । ইংরাজি Dialectics এর উদ্ভব গ্রীক শব্দ 'dialego'থেকে যার অর্থ বিতর্ক বা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মত্যে উপনীত হওয়া । বিখ্যাত জার্মান দার্শনীক Hegel তাঁর ভাববাদী তত্ত্বে সর্বপ্রথম দ্বন্দ্বের (Dialectics) উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু Karl marx ও Frederic Engels হেগেলীয় তত্ত্বের সম্পূর্ন বিপরীত এই নীতি প্রতিষ্টা করেছেন । অর্থাৎ marx ও Engel হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের সারাংশকে গ্রহন করে দ্বন্দ্বতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক রুপ দিয়েছেন ।

দ্বন্দ্বতত্ত্বে ভিত্তি হল 'দ্বান্দিক যুক্তিবিদ্যা' । এক্ষেত্রে 'x' বস্তুজগতের অংশ রুপে নিজেও পরিবর্তনশীল; এবং 'x' এর অবস্থিতি একই সঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক কারণ 'x' এর অস্তিত্ব চুড়ান্ত নয়, তা গতিশীল । দ্বান্দিক বস্তুবাদ এই প্রত্যাক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত একে দ্বান্দিক বস্তুবাদ বলা হয় । কারণ বস্তুজাতগত সম্পর্কে এর দৃষ্টিভঙ্গি ও তাকে ব্যাক্ষার পদ্ধতি হয় 'দ্বান্দিক' ও সেই সম্পর্কে এর ধারনা তত্ত্ব হল 'বস্তুবাদী' । দ্বান্দিক বস্তুবাদের আলোচনা তিনটি সূত্র প্রধান । এই সূত্রগুলির ব্যাখ্যার মাধ্যমে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে অনুধারন করা যায় ।

প্রথম সূত্র ঃ পরিমানগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন । বস্তুজগতের বস্তুরাশি পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের দিকে, বিশ্ব,ক্রমশ ; কিন্তু এই পরিবর্তন সূচীত হয় হঠাৎ উল্লমফনের(Ieap)মাধ্যমে । এই ভাবে সহজ থেকে জটিল,নিম্মতর থেকে উচ্চতর পর্যায়ের বস্তুর বিকাশ ঘটে ।

যেমন, অক্সিজেন (O2) দুটি অনু থাকে ; যদি একটি অনু যোগ করা হয় , তবে অক্সিরজন পরিবর্তিত হবে ওজোন (ও=O2+O)গ্যাসে যা গুনগতভাবে অক্সিজেনের থেকে সম্পর্নই পৃথক। আবার জলকে উত্তাপ প্রদান করলে,তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ১০০° সেন্টিগ্রেড হয়ে জল বাস্পে রুপান্তরিত হয় ।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ বৈপরীত্যের ঐক্য ও সংগ্রাম

দ্বান্দিক বস্তুবাদ অনুসারে, বস্তুর পরিবর্তনশীলতার কারণ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই নিহিত থাকে ।প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য একইসঙ্গে অবস্থান করে ও উভয়ের পারুপারিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই বস্তু বিকশিত হয় । বস্তুর মধ্যে যতক্ষন বিপরীত বৈশিষ্ট্য/ গুনের সমন্বয় অটুট থাকে , ততক্ষন বস্তু স্থিতিশীল থাকে । কিন্তু ক্রমশ এই সমন্বয় লোপ পেয়ে বিরোধের তিব্রতা বাড়লে স্থিতিশীলতা নষ্ঠ হয় ও বস্তুর গুনগত পরিবর্তন ঘটে ।

যেমন, মরু অঞ্চলে দিনে সূযালোকের প্রখর তাপে ও রাতে শীতলতার কারণে শিলখন্ডের উপরিত্বক পেঁয়াজের খোসার মতো খুলে যায় । এই 'শঙ্কমোচন' প্রক্রিয়ায় শিলার রুপান্তর ঘটে বিপরীত ঐক্য ও সংগ্রামের ফলে । আবার ধনাত্মক ও ঋনাত্মক বিদ্যুতের প্রবাহের ফলেই ।

তৃতীয় সূত্র ঃ বিকাশের পথে বিলুপ্তি/বিলুপ্তির পথে বিকাশ

প্রত্যেক বস্তু তার পূর্বের অবস্থাকে বিলোপ ঘটিয়ে পরবর্তী স্তরে বিকশিত হয় । তাই,এই সূত্রকে বলা হয় ঃ নেতির নেতিকরন । অর্থাৎ পুরানো থেকেই জন্ম হয় নতুনের । কিন্তু, এই বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, বাস্তু তার পরবর্তী স্তরে যা কিছু শ্রেষ্ঠ গুনা বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিকাশের উচ্চতর স্তরে বহন ও সংরক্ষন করে ।তাই, বস্তু পরিবর্তন কেবলমাত্র পূর্ব অবস্থায় বিলোপ বা ধ্বংস বোঝায় না, বরং এটি একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া ।

এই সূত্র অনুসারে, প্রথম যে বস্তুর অবস্থার বিলোপ ঘটে,তাকে বলা হয় 'বাদ' (Thesis),যে বস্তু বিলোপ ঘটায় তা হল 'প্রতিবাদ'(Anti-Thesis) ও এটি সাবিত হয় সম্বাদের মাধ্যমে ।

যেমন, একটি বীজ মানব ভ্রন তার বীজভ্রন অবস্থায় বিলোপ ঘটিয়ে বৃক্ষে শিশু ভুমিষ্ট হয়ে ওঠে , অর্থাৎ ভ্রন বিকাশিত হয় । আবার এই বৃক্ষের ফল থেকে পুনরায় বীজের সৃষ্টি হয় ।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে, বৈর সমাজেই দুই পরস্পর বিরোধী শ্রেনী অবস্থান করে । যেমন, সামান্ততান্ত্রিক সমাজে ভূমিদাস ও ভূস্বামী শ্রেনি । প্রকৃতপক্ষে মার্ক্স পূর্বে উদারনৈতিক তাত্ত্বিকরাই , যেমন Adam Smith ও David Ricardo সমাজ শ্রেনির উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন ; এবং তারা আয়ের উৎসের পার্থকের ভিত্তিতে তিনটি শ্রেনিকে চিহ্নিত করেছিলেন - পুঁজিপতি ,জমিদার ও শ্রমিক । কিন্তু তা ছিল মার্ক্স শ্রেনি তত্ত্বের তুলনায় পৃথক ও অংশগতিপূর্ন ।

মার্ক্সই সর্বপ্রথম শ্রেনির উদ্ভবের ও শ্রেনি চরিত্রের বিশ্লেষণ করলেও, শ্রেনির পুর্নাঙ্গ সংস্থা দান করে যেতে পারেননি । এই কৃতিত্ব লেলিনের । তিনি তাঁর 'The Great Beginning' (1919) গ্রন্থে সর্বপ্রথম শ্রেনির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সমক্যভাবে ব্যাক্ষা করেন ।

১) শ্রেনি হল সামাজিক বর্গ যা ইতিহাসের অগ্রগতির প্রেক্ষিত উদ্ভব হয় ও নিদির্ষ্ট হয় ।

২) উৎপাদনের উপকরনের উপর আধিপত্য শ্রেনির বৈর বা অবৈর চরিত্র নির্ধাবন করে দেয় ।

৩)উৎপাদনের উপকনের সঙ্গে শ্রেনির সম্পর্ক শ্রমের সংগঠনে শ্রেনির ভুমিকাকে স্থির করে দেয় ।

৪)সামাজিক সম্পতি কীভাবে ও কতপরিমানে অধিকার করা হয়েছে তা শ্রেনির চরিত্রকে আলোকিত করে তোলে ।

সুতরাং, লেলিন বলেছেন যে, 'Classes are groups of people one of which can appropeiate the labour of another ouring to the differrent places the occupy in a definite system of soceal economy'.

শ্রেনি আবার দুই প্রকারে হতে পারে ।

ক) মূখ্য শ্রেনি (Basic class) ঃ যে শ্রেনি ব্যতি রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অচল,যেমন পূজিবাদী সমাজে'পুজিপতি শ্রেনি' ও 'শ্রমিক শ্রেনি' ।

খ) গৌন শ্রেনি (Non-Basic class) ঃ যে শ্রেনিগুলি প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় । যেমন , মধ্যবিত্ত, শিক্ষক, আমলা, লুলেন ইত্যাদি ।

দ্বান্দিক বস্তুবাদের উপসংহার ঃ

অর্থাৎ, মাক্সবাদের অন্যতম প্রধান নীতি হিসাবে দ্বান্দিক বস্তুবাদ জগত ও জীবনের পরিবর্তনের উত্তরনের এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে । কারন ঃ '' ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম বস্তু - একটি বালুকনা থেকে সূর্য অবধি, আদিম প্রানকোষ থেকে মানুষ পর্যন্ত - সমগ্র প্রকৃতিই প্রতিনিয়ত আবির্ভূত ও বিলুপ্ত হচ্ছে , প্রতিক্ষনেই পরিবর্তন সংগঠিত হচ্ছে - সকল বস্তুই নিরবছিন্ন গতি ও রুপান্তরের অবস্থায় রয়েছে ।' এই সত্য প্রতিভাত হয়েছে ই নীতির , তথা মার্ক্সবাদে ।

'মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ বা দ্বান্দিক বস্তুবাদ বহুযুগ ধরে মানুষের সঞ্চিত অধিজ্ঞতা ও ভান্ডারকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ।'

প্রশ্ন ঃ ব্রিটেনের কমন্সসভা ও মার্কিন প্রতিনিধি সভার তুলনামূলক আলোচনা কর ।

ভূমিকা ঃ মার্কিন আইনসভাকে কংগ্রেস বলা হয় এবং কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হল প্রতিনিধি সভা । ব্রিটেনের আইনসভার নিম্নকক্ষ হল কমন্সসভা । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন হল উদারনৈতিক দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত দুটি বৃহৎ উদারনীতিবাদী গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র । দুই বৃহৎ উদারনীতিবাদী গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভার দুটি নিম্নকক্ষের মধ্যে সাদৃশ্যও যেমন আছে,তেমনই বৈসাদৃশ্যও কম নয় ।

সাদৃশ্য ঃ মার্কিন প্রতিনিধিসভা ও ব্রিটিশ কমন্স সভার মধ্যে সাদৃশ্যগুলি হল -

১)প্রতিনিধিসভা ও কমন্স সভা উভয় সংস্থায় হল নিজ শাসনব্যবস্থার আইনসভার নিম্নকক্ষ ।

২)প্রতিনিধিসভা ও কমন্স সভা উভয় সংস্থার সদস্যরা প্রত্যেক্ষভাবে জনগন দ্বারা নির্বাচিত হন ।

৩) উভয় শ্সনব্যবস্থায় এই সংস্থা দুটি সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা ভোগ করে । উভয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব সংস্থা দুটি অনুমোদন ছাড়া কার্যকর হয় না ।

৪)উভয় সংস্থায় বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে তাদের কাজকর্ম পরিচারনা করা ।

৫) উভয় সংস্থাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের ওপর আলোচনা ও বির্তকের ক্ষেত্রে হিসাবে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে ।

৬) উভয় সংস্থাই নিজ নিজ শাসন ব্যবস্থার জনমত গঠনের গুরুত্বপূর্ন মাধ্যম হিসাবে কাজ করে ।

৭) প্রতিনিধি সভা পরিচালনা করে একজন স্পিকার । কমন্সসভা পরিচলনার জন্যেও একজন স্পিকার আছে ।

বৈসাদৃশ্য ঃমার্কিন প্রতিনিধিসভা ও ব্রিটিশ কমন্স সভার মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলি হল-

১) ব্রিটেনের কমন্সসভা কোনো সাংবিধানিক আইন দ্বারা সৃষ্টি নয় । ব্রিটেনের প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা, রীতিনীতি,ঐতিহ্য ও প্রথাগত আইন এর মাধ্যমে কমন্সসভার উদ্ভব ঘঠেছে । কমন্স সভা ব্রিটেনের দীঘ্য ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল । মার্কিন প্রতিনিধি সভা মার্কিনবিধান দ্বারা সৃষ্টি সংস্থা ।

২বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রথা ও রীতিনীতির মাধ্যমে ব্রিটেনের কমন্সসভার ক্ষমতা ও মর্যাদার বিকাশ ঘটেছে । প্রতিনিধিসভার ক্ষমতা ও মর্যাদা মার্কিন সংবিধানে উল্লেখিত আছে ।

৩) ব্রিটিশ কমন্সসভার কার্যকাল ৫ বছর । কিন্তু মার্কিন প্রতিনিধিসভার কার্যকাল ২ বছর । ৫ বছর শেষ হওয়ার আগে রাজা বা রানী কমন্সসভাকে ভেঙ্গে দিতে পারেন । কিন্তু কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি প্রতিনিধিসভাকে ভেঙ্গে দিতে পারেন না ।

৪) ব্রিটেনের কমন্সসভা আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে । যে কোন সাধারন বিল ব্রিটেনের আইনসভার দুটি কক্ষের অনুমোদন ছাড়া পাশ করা যায় না । কিন্তু লর্ডসভা সাধারন বিলকে এক বছর পর্যন্ত আটকে রাখতে পারে । অর্থাৎ সাধারন আইন পাশের ক্ষেত্রে কমন্সসভার প্রধান্য দেওয়া যায় ।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারন বিলের ক্ষেত্রে আইন সভার দুটি কক্ষ সমান ক্ষমতা ভোগ করে ।

৫)ব্রিটেনের কমন্সসভা যে সমস্ত বিল বিবেচনার জন্য কমিটিগুলির কাছে পেশ করে , কমিটিগুলি সেগুলি বিবেচনা পর কমন্সসভায় ফেরত পাঠায় । মার্কিন যুক্তরাষ্টের প্রতিনিধিসভা তার কমিটিগুলির কাছে যে সমস্ত বিল প্রেরণ করে তাদের মধ্যে প্রায়-একপঞ্চমাংশ বিল সম্বন্ধে কমিটিগুলি সভার কাছে রিপোর্ট পেশ করে । বাকিগুলি কমিটির ফাইলে থেকে যায় এবং বিলগুলির যবনিকা ঘটে ।

৬)ব্রিটেনের প্রতিনিধিসভায় প্রেরিত বিরগুলি সরকারী বা পাবলিক ও বেসরকারী বা প্রাইভেট এই দুভাগে বিভক্ত ।উভয় ধরনের বিল পাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসারন করা হয় । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উভয় ধরনের বিলের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না ।

৭) ব্রিটেনের কমন্সসভার সদস্যপদ রাজনৈতিক ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ন । তরুন ও উচ্চভিলাসী রাজনীতিবীদদের কাছে এই পদের বিশেষ গুরুত্ব আছে । কিন্তু মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধিসভার সদস্যপদের থেকে সিনেটসভার সদস্যপদের গুরুত্ব অনেক বেশি ।

৮) কমন্সসভার বিরোধী দল গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে ।বিরোধী দলকে রাজা বা রানীর বিরোধী দল বলা হয় । প্রতিনিধিসভায় বিরোধী দলের ভুমিকা গুরুত্ব দেওয়া হয় না ।

প্রশ্ন ঃ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা কর ।

রাজনৈতিক সমাজতন্ত্র (Political Sociology) হল ডিসিপ্লিন; বৌদ্ধিক বিবর্তনের ফলশ্রুতি; যেমন,চিকিৎসাবিজ্ঞানে,'GRAM THEORY' বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক 'Medicine' -এর সৃষ্টি করেছে । অনুরুপে ,প্রায় তিন সহস্র বছরের সুসমৃদ্ধ 'রাজনীতি শাস্ত্র' (Political Science),বিংশ শতাব্দীতে 'সমাজ তন্ত্র' -এর () সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে নবতর সমাজ রাজনৈতিক ডিসিপ্লিন (Sociopolitical Discepline)- এর জন্ম দিয়েছে, সেই ডিসিপ্লিনই হল ঃ 'Political Sociology' উভয় শাস্ত্রের এই সসন্বয় ও পরস্পর নির্ভরশীলতা বহুলাংশে ' গনিত' ও 'অর্থনীতির' সহনির্ভরতার সঙ্গে তুলনীয় । রাজনীতি শাস্ত্র ও সমাজতত্ত্বের এই সমন্বয় সম্পর্কে তাঁর 'The science and Method of Politics' শীর্ষক প্রবন্ধে ১৯২৭ খ্রীঃ George CatlinPlato তাই সতর্ক করে বলেছিলেন ঃ The danger of mergine politics,as a subdivision of sociologe.

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব মূলত তিনটি কারনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, ১৯৫০ -১৯৬০ খ্রীঃ এর পূর্বে, মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি পৃথক ডিসিপ্লিন রুপে আত্মপ্রকাশ করে ঃ ক) রাজনীতি শাস্ত্র Plato থেকে T.H.Green পর্যন্ত ছিল ঐতিত্যবাদী ও নীতি মানবাচক । তা ছিল মূল্যবোধ যুক্ত ও বহুলাংশে অধিবিদ্যামূলক। কিন্তু সমাজতত্ত্বের প্রকৃত বিজ্ঞান অনুসারী 'দৃষ্টিবাদী' ধারনা রাজনীতিকে মূল্যনিরোপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছিল । তাই দৃষ্টিবাদী তত্ত্বের উত্তরসুরী হিসাবে ' আচরনবাদ' ও এই পূর্বে সমাজতত্ত্বের পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য রাজনীতি শাস্ত্রকে অনুধারনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে । খ) রাষ্ট্র ও সমাজের দ্বিমুখী সম্পর্কের পরিবর্তন (the chingine aspect of state society's two way relation)কেবলমাত্র রাজনীতি শাস্ত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ দুরহ হয়ে পরেছিল ।Max weber এর দ্বারা প্রভাবিত আমেরিকা অভিবাসী জার্মান সমাজতাত্ত্বিকরা এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভবকে তরান্বিত করেছিলেন ।

এবং গ) বিংশ শতকে উপযোগবাদী তত্ত্বের ভোগবাদী ও ক্রেতাবিক্রেতা রুপে ব্যক্তিকে দেখার ধারনা পরিবর্তে, একক, বিছিন্ন,পুঁজি সন্ধানী ব্যক্তির ধারনাকে অতিক্রম করে গোষ্ঠী-কোম ও সম্প্রদায়ের ধারনা ,জাতির ধারনা গুরুত্ব অর্জন করতে থাকে । এই 'যোথত্ব' এর ধারনা (concept of the collective) কেবল রাজনীতি শাস্ত্রের দ্বারা ,বা এর মধ্যে নিহিত ক্ষমতা ও প্রদান করা অসম্ভব ছিল । তাই, যৌর্থাত্ব ও তার অর্ন্তস্থ ক্ষমতার বিন্যাসকে সম্যকভাবে বুঝতেই এই আন্তঃ বৈষয়িক (Interdisciplinary) শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে যার নাম রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব ।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব সমাজ ও রাজনীতির বহুবিধ উপাদানকে সমগ্রের ও পরস্পরিকতার পেক্ষিতে বিচার করে । মূলত আচারনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি হিসাবে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বেব উদ্ভব এর নিজস্বতাকে স্বাতন্ত্র্যকে স্থির করেছে । রাজতৈতিক সমাজতত্ত্বের পরিধি নির্ধারিত হয়েছে সুনির্দিষ্ঠভাবে ।

১)সমাজতত্ত্বের ' বনর্ণামূলক আলোচনা'(Descriptive-Discussion) পবিবর্তন হয়েছে 'বিশ্লেষন' (Analysis).

২) রাজনীতি শাস্ত্রের রাষ্ট্র কেন্দ্রিকতা (State- centrism) পরিবর্তন হয়েছে 'ক্ষমতা সম্পর্কে' (Power- relasion).
৩)ঐতিহ্যবাদী, নীতিমানবাচক ধারনা পরিবর্তন হয়েছে ' সমাজ রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার'(Process of Social-political change). এবং
৪)নৈতিক/দার্শণিক মতামত থেকে 'সুসংবদ্ধ তত্ত্বয়ন'(organized theorization) গুরুত্ব অর্জন করেছে ।

এই কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ন প্রতিটির কারনে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের পরিধি সমাজ ও রাজনীতি বা 'the social and the political' এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে , উভয়কেই স্বতন্ত্র্য ও স্বধীন (Independent) ক্ষেত্রে রুপে স্বীকরে করে, সেখানে রাজনৈতিক সমাজতন্ত্র উভয়ের বহুমাত্রিক উপাদান ও দ্বিমূখী প্রক্রিয়াকে অনুধারনে সচেষ্ট থাকে । অর্থাৎ ,রাজনৈতিক সমাজতন্ত্র ঃ 'Inter-dicilplinary' । তাই রাজনৈতিক সমাজতন্ত্রের পরিধি পরিবর্তরশীল ,আপেক্ষিক ও নমনীয় । রাজনৈতিক সমাজতন্ত্রের পরিধি সম্পর্কে R.Bebdix S.M.Lipset তাঁদের প্রবন্ধে 'Political Sociology an Essay and Bioligraphy'1957'' এ বলেছেন political science state with the states and examines society,while political sociology starts with society and examines how it affects the state.

আচারনবাদের ফলহিসাবে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বো রাষ্ট্রকে (State) 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা' কে (political system) ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী, যেহেতু রাজনৈতিক ব্যবস্থা কেবলমাত্র সরকারী (formal) কাঠামো ও ভুমিকাকেই নয় ,পরিবার, জ্ঞাতিত্ব, শ্রেনি, জাত,এথনিসিটি ইত্যাদি অসরকারী (Informal) ক্ষেত্রগুলিকেও গুরুত্ব দান করে, তাই রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু এর অর্ন্তগত ।

বস্তুত,রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ক্ষমতা ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়বস্তুই মৌলিক আলচ্য । Tom Bottomore তাঁর বিখ্যাত political socielogy গ্রন্থের প্রধম পঙতিতেই লিখেছেন ঃ political socielogy is concerned with power in its social content. একই ভাবে বিখ্যাত ফরাসী সমাজতত্ত্ববাদ Maurice Duverger তাঁর The Idea of politices : the uses of power in socielity(1967) গ্রন্থে রাজনেতিক সমাজতত্ত্ব কে কতৃত্বের /ক্ষমতার সম্পর্কে বিজ। বিজ্ঞান বলেছেন । তার মতে ,ক্ষমতা সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরই বৈশিষ্ট্যগত উপাদান ।

Gioveni Sartori তার Sociology of politices to political sociology (1972) শীর্ষক প্রবন্ধে দাবি করেছেন যে, Political sociology-sociology of political samething এখানে 'samething ' এর অর্থ যেহেতু রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের বেশী কিছু, তাই একাধিক সম্ভাব্য বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভক্ত হতে পারে ।

১)রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ।
২)রাচনৈতিক কাঠামো সমুহের কার্যগত ব্যাখ্যা ।
৩) প্রবর ও নের্তৃত্ব ।
৪) রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সমূহ, যেমন রাজনৈতিক স্তরবিন্যাস, সামাজিকীকরন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ।
৫)রাষ্ট্র ও জাতি গঠনের প্রক্রিয়া ।
৬) রাজনৈতিক গতিশীলতা সচলতা, নিয়োগ, অংশগ্রহন, যোগাযোগ ।
৭)রাজনৈতিক গোষ্ঠী- দল, স্বার্থগোষ্ঠী,লবি,জনমত,বিপ্লব ।
৮)পরিবর্তনের প্রক্রিয়া - আধুনীকীকরন , উন্নয়ণ, বিপ্লব ।
৯) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান- আমলাতন্ত্র,সামরিক বাহিনী ।
১০) রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রীক মূল্যায়ন ।

এছাড়াও ১৯৯০ সালের দশকে সমগ্র বিশ্বে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের তিনটি গুরুত্বপুর্ন বিষয়বস্তুর উদ্ভব ঘটেছে যা এই ডিসিপ্লিনের 'আদিকল্প রুপান্তর' (Perdigm shift) ঘটিয়েছে ঃ

১) পরিবেশ
২)সন্ত্রাসবাদ
৩) নতুন সামাজিক আন্দোলনসমূহ (The new social Movements)

Kate Nash তাঁর 'Contemporary political sociology' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বহু তত্ত্ব ও ধারনার ক্রমবিবর্তনের ফলে ডিসিপ্লিন হিসাবে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে, নিরুপিত হয়েছে এর পরিধি ও বিষয়বস্তু ।Max Weber থেকে Antonio Gramsci হয়ে পর্যন্ত ও তারপরেও এর ব্যক্তি ঘঠেছে । তাই পশ্চিমের (Occident) গন্ডি অতিক্রম করে তৃতীয় বিশ্বেও এর চর্টার সূত্রপাত ঘটেছে ।

প্রশ্ন ঃ ধর্ম সম্পর্কে মার্কসীয় ধারনা আলোচনা কর ।

Marxist views on Relogiom

'ধর্ম'(Religion) - সম্পর্কিত মার্কসীয় দৃষ্ঠিভঙ্গি এক অসাধারন বৈজ্ঞনিক অনুসন্ধানের ফল । এই দৃষ্ঠিভঙ্গিটি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপর স্থাপিত । ধর্ম সম্পর্কিত মার্কসীয় দৃষ্ঠিভঙ্গি অভিনব ,কারন এর পূর্বে অন্যকোন তত্ত্ব/ দৃষ্ঠিভঙ্গি এত নৈব্যক্তিক নির্মোহ নিরোপেক্ষ ভাবে ধর্মকে ব্যাখ্যা করেননি এবং একাধারে এই দৃষ্ঠিভঙ্গি ব্যতিক্রমী কারন তা অন্যান্য প্রচলিত তত্ত্বের মতো ধর্মকে অলৌকিক, বাস্তবহীন, স্বয়ং সম্পূর্ন বিষয়রুপে স্বীকার করেননি । এই বিষয়ে মূল কারন সূত্রগুলি তিনটি প্রধান প্রতিপক্ষ প্রতিফলিত করে ঃ

১) ধর্ম কোন চিরন্তর, অখন্ডনীয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social institution) নয় , মানব সমাজের বিকাশের এক বিশেষ পর্বে যেমন এর উদ্ভব ঘটেছে ,তেমন এক স্তরে এক বিলপ্ত ও অনিবার্য (রাষ্ট্রের মতো) ।
২) অর্থনৈতিক ভিত্তির (BASE) উপর প্রতিষ্ঠিত উপরিকাঠামোর (super structure) বহুবিধ অন্যান্য উপাদানরে মধ্যে ধর্ম একটি উপাদান মাত্র । তা স্বয়ং -সম্পূর্ন । এবং
৩)প্রত্যেক শ্রেনি বিভক্ত বৈর সমাজে রাষ্ট্রের মতোই ধর্ম ও শ্রেনি শোষনের প্রধান মাধ্যম রুপে ব্যবহৃত হয়েছে । শাসক শ্রেনির স্বার্থ রক্ষার্থে ।

ধর্ম সম্পর্কিত Karl Marx (18-18) এবং Frederick Engels এর চিন্তাসূত্র একাধিক রচনায় অধিন্যস্ত ভাবে বিক্ষিপ্ত রয়েছে । ধর্ম সম্পর্কে তাই তাদের কোন সুসংবদ্ধ তত্ত্ব নির্মিত হয়নি অ রাষ্ট্র বা শ্রেনির সম্পর্কে তত্ত্বের মতো কিন্তু Trevor Ling এর 'Karl Marx and Religion in Europe and India(1980)' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, মার্কসীয় চিন্তার সামগ্রীকতার মধ্যেই ধর্ম প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির এক প্রকারের ক্রমবিবর্তন দৃশ্যমান হয় । Marx এর Contribution to the Hegel's philosophy of right : An Institution ,Thesis on Feuerbach , Critique Ideology,the Holy family ,Engles - এর Anti During, Reqtecfics of Nature এর গ্রন্থে ধর্ম সম্পর্কিত মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির ধারনা বর্তমান ।

Hege তাঁর ভাববাদী দর্শণে দেখিয়েছেন যে, ধর্ম হল বস্তুজগৎ ও বর্হিভূত এক অপার্থির শক্তি যা ব্যক্তি সমাজ এবং রাষ্ট্রের ঐক্য ও অন্তরীন বিকাশকে তরান্বিত করে , পরিপূর্নতা দান করে । তাই রাষ্ট্র হল পৃথিবীতে'ঈশ্বরের পদচারনা' এবং ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রতি উৎসর্সীকৃত ।Hegel এর এই অধিবিদ্যাত্মক(Metaphisical)তত্ত্বকে খন্ডন করে Makx দেখান যে, বস্তুর বিকাশের মূলে দ্বন্দ্ব (Riqlectics) সত্যি তা সত্য, কিন্তু ভাব (ldea) বস্তুর বিকাশের ইতিহাস । তাই ধর্ম/ ঈশ্বর রাষ্ট্রের ভিত্তি , রাজনীতির ভিত্তি নয় বরং ধর্ম একটি প্রতিষ্ঠান যার উৎস নিহিত আছে । বস্তু ও বস্তুর দ্বান্দ্বিক বিকাশের মধ্যেই এবং তাই 'বিচ্ছিন্নতার' অন্যতম কারন ও হল ধর্ম ও তার প্রতি অন্ধ,মুক্তি,যুক্তিহীন বিশ্বাস, আনুগত্য ।

এই ধারনা থেকে সমাজ বিকাশের প্রবাহকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে মার্কসীয় তত্ত্বের ধর্মের উপর উদ্ভব ও প্রগতিকে উদ্ভাসিত করা হয়েছে ।আদিম সাম্যবাদী সমাজের মানুষের উৎপাদিকা শক্তি ও ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত অনুন্নত । তাই মানবজীবনের অধিকাংশই অভিবাহিত হত প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই অসহায়, দুর্বল, মানবগোষ্ঠী বৃদ্ধি, বজ্রপাত,খড়া, দাবাগ্নি বা হিংস্রপশুর বিরুদ্ধে তাদেরই অনুকারন মূলক প্রতিকৃতি ও আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা এই দুর্বলকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন । Engeks বলেছিলেন যে এই ভাবে প্রথমে সৃষ্টি হয় ইন্দ্রজালের ও তারই বিবর্তিত হল -'ধর্ম' । আবার অদিম জনগোষ্ঠীগুলি যেমন পরিচালিত হত গোষ্ঠীর প্রধানদের দ্বারা ,প্রকৃতির ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে অক্ষম অনুন্নত মানুষ তেমনি কল্পনা করে নিয়েছিলেন যে, এই বিশ্ব চরাচর ও তেমনি নিয়ন্ত্রিত হয় একজন সর্বচ্চ শক্তি সম্পন্ন অদৃশ্য সত্তার দ্বারা - যিনি' ঈশ্বর' এই ' তুলনামূলক সাদৃশ্যগত যুক্তি '(Compariative Logical reasoning) ই- মানব মনে বস্তুজগতের প্রতিচ্ছবি রুপে ঈশ্বর ও ধর্মভাবনার সৃষ্ঠি করেছিল ।

মার্কসীয় ধারনায় ধর্মের ভূমিকা হল আফিমের মতো 'Contri by to the critique of Hegels philosophy তে Makx বলেছেন It is the fantastic realization of the human essence becouse the human essebce has no true reality- তাই মানুষ তার যাবতীয় বস্তুগত দুঃখদুর্দশাকে বিস্মৃত হতে ধর্মকে আশ্রয় করে, ঈশ্বর ও পরলৌকিক, কাল্পনিক সুখস্বপ্নে মনন হয় । ধর্মের নেশায় আচ্ছনন হয়ে সে তার সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকা, তা দুঃখ দুর্দশার বাস্তব কারন অনুসন্ধান না করেই দুর্ভাগ্য রুপে তাকে গ্রহন করে । ফলে প্রত্যেক শ্রেনি বিভক্ত বৈর সমাজেই শাসক শ্রেনি ধর্মকে শ্রেনি শোষনের হাতিয়ার রুপে । প্রত্যেক শ্রেনি শোষন কেন্দ্রিক সমাজে ক্রীতদাস সমাজ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বা আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ শোসন ধর্মাশ্রয়ী রুপ পরিগ্রহন করে ফলে পরজাগতিক সুখের আসায় মানুষ প্রতিবাদ শূন্য, রাজনীতি বিমূখ সমাজ বিচ্ছিন্ন নির্জীব সত্তায় পরিনত হয় । তাই ধর্ম ও ঈশ্বর ভাবনা হল এক সর্বগ্রাসী মিথ্যা সান্তনা ।

এই আলোচনা থেকে অনুমিত হয় যে, ধর্ম শাসক শ্রেনি স্বার্থপূরক । কিন্তু ধর্ম সম্পর্কিত মার্কসীয় ধারনাটি ধর্মকে কেবল এরুপ একাদশদর্শী (one sided) দৃষ্ঠি কোন থেকেই বিচার করে না , তা ধর্মের প্রগতিমূলক ভূমিকাকেও আলোকিত করে । তা স্বীকার করে যে, ঐতিহাসিক অবস্থা বিশেষে ধর্ম শ্রেনি সংগ্রামকে তরান্বিত করার'অনুঘটক' রুপেও তার ভূমিকা পালন করেছে ।যেমন George Tomson তার relogioশীর্ষক পুস্তিকায় বলেছেন যে সামান্ত তন্ত্রের সৃষ্ঠির যুগে যুগে পূর্বাপর যেকোন অবস্থার তুলনায় ' খ্রীষ্টধর্ম' সর্বপেক্ষা গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছিল । খ্রীষ্টের অনুকৃতিতেই ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন । তবু আমাদের উপর এমন পশুর মতো ব্যবহার কেন করা হয় ? ১৩৮১ খ্রীঃ ইংল্যান্ডের কৃষক বিদ্রোহে ' লোলার্ড বিদ্রোহ'- এই প্রশ্নই শোষিত শ্রেনিকে সংগ্রামের অনুধাবিত করেছিল । তাই ধর্মের ভূমিকাকে গ্রহন করে সমাজতান্ত্রীক বিপ্লবোত্তর সমাজ তন্ত্র নির্মানের কর্মসূচিতে ধর্মের বিরুদ্ধাচরন করা হয়নি । মার্কসবাদ ধর্মের প্রগতিমূলক রূপটিকে স্বীকার করেন কিন্তু, এর অর্থ এই নয় যে, তা ধর্মকে স্বীকার করে। ধর্ম যুক্তি ও বিজ্ঞানের ঠিক বিপরীত ; তাই

কোন বৈপ্লবিক কর্মকান্তে যে ধর্ম প্রগতিশীল ছিল , তাকে বিকৃত করে সহজেই তাকে বিপ্লব বিরোধী করে তোলা যায় । তাছাড়া ধর্ম হল একটি পশ্চাৎপর ধারনা , সুতারাং এর সাহায্যে কেবল অন্যায়ের প্রতিবাদ সম্ভব পর, সমাজ বিপ্লবের বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহন করা যায় না ।

Makxবলেছেন -' Man makes religion, religion does not make man...religion is the appressed creature the heart of hartless world. It is the opium of the people' তাই যেদিন থেকে উৎপাদনের উপকরনগুলি(means of productions)হবে সামাজিক যৌথ সম্পত্তি যখন মানুষ তার প্রয়োজন অনুসারে সবকিছু পেতে পারবে, সেদিন মানুষের সেই আদীম অসহায়ত্ব এবং দুর্বলতা সামাজিক বিকাশের ধারায় যা ধর্মের রুপ লাভ করেছিল, তার বিলুপ্ত ঘটবে চিরকালের মতো ।

প্রশ্ন ঃDefination, nature and scope of public Adminiotration. Is the public adminiotration science or Arts.

জন প্রশাসন পদটির মধ্যে দুটি শব্দ আছে । জন ও প্রশাসন । জন শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ হল 'Public' আর প্রশাসন 'Adminiotration' অর্থাৎ যে প্রশাসন সামগ্রীক ভাবে এবং কোন রকম বাছবিচার না করে সমগ্র সমাজের দিকে লক্ষ রেখে পরিচালিত হয় ,তাকে জন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, আর প্রশাসন ামরা তাকেই বলব যা জনগনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত ।

জন প্রশাসন বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে মতামত আলোচনা করা যেতে পারে, বর্তমানে আমরা যে বিষয়টিকে প্রশাসন নামে অভিহিত করি কার্যত তার জন্ম মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের হাতে । তিনি তার 'The study of adminiotration' নামক বইতে বলেছেন যে, জন প্রশাসন হল জন সাধারনের জন্য রচিত আইনের অনুপুংখ এবং শৃঙ্খলা পরায়ন বাস্তব রুপায়ন ।গ্লাডন তার 'Intruduction of the publicadminiotration ' বইতে বলেছেন যে, গন সংগঠন বা জনগন প্রতিষ্ঠান গুলির পরিচালনাই হল জন প্রশাসন । নাইগ্রো ও জন প্রশাসনকে ব্যাপক দৃষ্টিকে দেখেছেন, তার মতে নীতি নির্ধারন, সমন্বয় সাধন থেকে শুরু করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমদ্ধ স্থাপন ইত্যাদি বিষয় এর অর্ন্তভূক্ত । উড্রো উইলসন জন প্রশাসনকে ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখেছেন, তার মতে'Public administruation is detailed and gstematic exeqution'

জন প্রশাসন রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত বলে একে স্থিতিশীল বলা চলেনা । রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে এর গতিশীলতা নিহিত । জন প্রশাসন হল সিদ্ধান্ত গ্রহন, করনীয় কাজ সম্পর্কে পরিচালনা নেওয়া এবং উদ্দেশ্য স্থির করা । কিন্তু জন প্রশাসন যারা চালান তাদের একার পক্ষে সরকারের অন্যান্য বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করা সম্ভব নয় ।তাই জন প্রশাসন বিভাগ আইন বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রেখে চলে । জন প্রশাসন একটি মাত্র বিভাগ নিয়ে গঠিত নয় । বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা ও যোগাযোগ বজায় রেখে জন প্রশ্সনকে চলতে হয় ।

জন প্রশাসন রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একটি পাখা মাত্র কিন্তু এর নিজস্ব স্বতন্ত্র্য আছে । বর্তমানে কেবল রাজনীতিবিদরা নীতি নির্ধারন করেন না । অভিজ্ঞ প্রশাসনরাও নীতি নির্ধারনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন । জন প্রশাসনরে গুরুত্ব যত বাড়তে থাকবে,স্বতন্ত্র্য বিষয়ের মর্যাদা পাবার দিকে অগ্রসর হতে পারবে ।

জন প্রশাসন বিজ্ঞান না সমাজ বিদ্যা তা অত্যান্ত বিতর্কিত বিষয় । উইলোবি আরউক গুলিক প্রভৃতি জন প্রশাসন বিজ্ঞানগন একে বিজ্ঞান পর্যায়ে উপাস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন । অপরদিকে একদল সমাজ বিজ্ঞানী জন প্রশাসনকে বিজ্ঞান পর্যায়ে ফেলতে রাজি নন । সাধারনত বিজ্ঞান শব্দের অর্থ হল বিশেষ রুপে জ্ঞান অর্থাৎ কোন ঘটনা সম্পর্কে সুশৃঙ্খল পর্যবেক্ষনের ফলশ্রুতি হল বিজ্ঞান । অন্যভাবে বলা যায় ' বিজ্ঞান হল কোন এক শ্রেনিভুক্ত বিষয়স্তু সুষমবদ্ধ জ্ঞান' । সুতারাং বিজ্ঞানের সংখ্যা থেকে আমরা তিনটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করি । একটি হল - বিজ্ঞান বলতে আমরা নৈতিকতা

পরীশালব্ধ জ্ঞানকে বুঝি । দ্বিতীয়টি হল - কার্য ও কারকের মধ্যে বিজ্ঞানের চিরন্তর সম্পর্ক থাকে , এবং তৃতীয়- বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সুসংহত ও সুশৃঙ্খলিত ।

বিজ্ঞানের উপরিউক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট অনুযায়ী বিশ্লেষন করতে গেলে জানা যায় জন প্রশাসন বিশ্লেষন নয় । কারন -

১) নৈতিকতা ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান নয় ঃ জন প্রশাসনে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যুক্ত পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের কোন রকম সন্ধান পাওয়া যায় না । জন প্রশাসন অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানমূলক বিষয়গুলির মতো একটি সম্পূর্ন মানবীয় বিষয় । জনগনের কল্যান ও মঙ্গর সাধনই এই প্রশাসনের মূল লক্ষ । জনপ্রশাসনের উৎপত্তি যেখানে মাসুষের সেবা ও কল্যানের জন্য সেখানে জনপ্রশাসন কখনই নৈতিক ধ্যান ধারনা বর্জিত হওয়া ছাড়া কোন রকম মানবীয় কর্মকান্ত সফর হতে পারে না ।

২) ব্যাপক বিষয়বস্তু ঃ যেহেতু জনপ্রশা্সনের বিষয়বস্তু মানুষ ও স্বাভাবিক কারনেই জনপ্রশাসনের বিষয়বস্তু পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অনেক বেশি ব্যাপক, জটিল ও অনিশ্চয়তা পূর্ন পরিবর্তনশীল ।

৩)ধারাবাহীকতাহীন এবং কাল্পনিক ঃ যে সমস্ত ঘটনাবলী ও বিচার নিয়ে জনপ্রশাসন আলোচনা করে, বিশ্লেষন করে ও পর্যবেক্ষন করে তার মধ্যে ধারাবাহিকতা ও সমরুপতার অভাব আছে এবং বাস্তব বর্জিত কাল্পনিক অনুমানের প্রভাব আছে ।যা পদার্থ বিষয়ক বিজ্ঞান গুলিতে কল্পনা বা পরিলক্ষিত করা যায় না । জন প্রশাসন মানবীয় সজীব বিষয় বলে, জনগনের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা তার পক্ষে কখনই সম্ভব নয় ।

৪) পরিবর্তনশীল ও সার্বজনীন নয় ঃ জন প্রশাসনের বিষয়বস্তু সর্বদাই পরিবর্তনশীল । ফলে জন প্রশাসন বিজ্ঞানী রসয়নবিদ ও পদার্থ বিজ্ঞানীর মতো দেশ কাল পাত্র নিরপেক্ষ অভ্রান্ত সার্বজনীন সত্য উপনিত হতে পারে না । অনুমানের উপর নির্ভর করে তারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশক্তির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে উপনিত হন এবং কিছু সাধারন সূত্র বের করেন ।

৫) মানুষ পরিক্ষার উপকরন ঃ যেহেতু ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ন মানুষকে নিয়ে আলোচনা করে এবং জন কল্যান মূলক পদ্ধতি ও প্রশাসনিক কৌশল উদ্ভব করাই জন প্রশাসনের একমাত্র লক্ষ্য । সেই কারনেই এই শাস্ত্রটিকেও অন্যান্য সকল প্রকৃতি বিজ্ঞানীর ন্যায় ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার চালাতে হয় অ কিন্তু ইচ্ছাশক্তি সদা পরিবর্তনশীল মানুষকে পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মতো পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে যেহেতু পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না , সেই কারনে অনুমানের উপর নির্ভর করেও বাহ্যিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয় । ফলে এর ভবিষৎবানী স্থান আল পাত্র নিরপেক্ষ কোন চিরন্তর সত্যের আদর্শ দিতে পারে না । যেমনটি পারে পদার্থ বিষয়ক বিজ্ঞানগুলি ।

৬) পরিমাপক নয় ঃ বিজ্ঞানের একটি পরিমানগত দিক আছে । তাই বিজ্ঞানকে পরিমান বলা হয় অ জন প্রশাসন বা যেকোন সমাজ বিজ্ঞান এই অর্থে নিজেকে বিজ্ঞান বলে দাবি করতে পারে না । তাছাড়া কার্য ও কারনের মধ্যে চিরন্তর সম্পর্ক আছে । যা জন প্রশাসনে লক্ষ্য করা যায় না ।

উপরোক্ত বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে , জন প্রশাসনের উক্ত শাস্ত্রকে বিজ্ঞান পর্যায়ে উন্নীত করা যায় না ।

অপর পক্ষে একদল পন্ডিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো জন প্রশাসনকেও বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে চান । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - উইলোবি, আরউইক, গুলিক মার্সন প্রভৃতি । তাদের মতে

ক) বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষন প্রয়োগযোগ্য ঃ অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো জন প্রশাসনও শ্রেনী বিভক্ত করন, বিশ্লেষন, পর্যবেক্ষন প্রভৃতি বৈদেশিক পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা যায় ।

২) বিষয়বস্তুর বৈজ্ঞানিক আলোচনা ঃ বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুসংবদ্ধ জ্ঞান লাভ করা বা বিষয়বস্তু সংগ্রহ তার জটিল পরীক্ষা ও প্রমান পত্রের সমীক্ষা বৈজ্ঞানীক পদ্ধতির প্রধান প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য । জন প্রশাসন শাস্ত্রেও এগুলির প্রয়োগ সম্ভব ।
৩)আচারনের সামঞ্জস্যতা ঃ মানুষের আচারনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় । এই সুসামঞ্জস্য আচরন থেকে সুসংবদ্ধ জ্ঞান লাভও করা যায় । এছাড়া মানুষের এই আচরন জন প্রশাসন বিজ্ঞানীরা সাধারন নিয়মে তৈরী করতে পারেন । যার সাহায্যে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান করা যায় ।
৪)শ্রেনি বিভক্তিকরন ঃ জন প্রশাসনের যেহেতু শ্রেনি বিভক্তিকরন বিশ্লেষণ পর্যবেক্ষন করা যায় । সুতারাং অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো জন প্রশাসনেও সাধারন সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় । সেইহেতু, জনপ্রশাসন শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে স্বীকার করা যায় ।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিঃসন্দেহে একথা বলতে পারি যে , জন প্রশাসন রাসায়ন ও পদার্থবিদ্যার মতো বিশুদ্ধ নয় । অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো অসম্পূর্ন বিজ্ঞান । সুতারাং বলা যায় জন প্রশাসনশাস্ত্র পর্যবেক্ষনমূলক বিজ্ঞান । পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান নয় । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো জন প্রশাসন শাস্ত্রও প্রগতিশীল জীবনের যেকোন গঠন নিয়ে আলোচনা করে । কারন মানুষের জীবন প্রনালী প্রগতিশীল, এই কারনেও জন প্রশাসন শাস্ত্রকেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো প্রগতিশীল বলা যেতে পারে । পরিশেষে আমরা গ্রেটেলের মন্তব্য অনুসরন করে বলতে পারি ' যদি বিজ্ঞান বলতে এই বোঝায় যে শৃঙ্খলিত পর্যবেক্ষন, পরিসংখ্যান, ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে কোন নির্দিষ্ঠ বিষয়ের সম্যোক জ্ঞান ও আলোচনা এবং এক সুসংবদ্ধ বিষয়ের বিশ্লেষন ও শ্রেনি বিভত্তিকরন,তাহলে জন প্রশাসনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যেতে পারে ।'

প্রশ্ন ঃ আনুমানিক ব্যয় নির্ধারন কমিটি/মূল্যয়ন কমিটি () ঃ
ভূমিকা ঃ ১৯৭৯ সালে অনুযায়ী একটি আনুমানিক ব্যয় নির্ধারন কমিটি() গঠনের কথা বলা হয় । এই আইনরে ভিত্তিতে ১৯২১ সালে এই কমিটি গছিত হয় । সেই সময় এটি সম্পূর্নভাবে অর্থমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রনধীন ছিল । স্বাধীনতা লাভের পর জনগনের অর্থ কিভাবে খরচ করা হচ্ছে তা দেখার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তার মধ্যে আনুমানিক ব্যয় নির্ধারন কমিটি অন্যতম । স্বাধীনতা লাভের পরই ১৯৫০ সালে নবগঠিত এই কমিটির কাজ শুরু হয় । তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ জন মাথাই এর উদ্দ্যোগে এই কমিটির যাত্রা শুরু হয় । তিনি উল্লেখ করেন যে,
গঠন ঃ ১৯৫০ সালে সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর স্বাধীন ভারতের প্রথম অর্থমন্ত্রী ডঃ জন মাথাই ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে মূল্যানুমান কমিটি কার্যবলী সম্প্রসারন করা হয় । হিসাব কমিটির মতো মূল্যানুমান কমিটিও ভারতের সংসদের একটি স্থায়ী কমিটি । প্রতি বছর লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এই স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় ।নির্বাচনের পদ্ধতি হল ' একক হস্তান্তরযোগ্য ' ভোট পদ্ধতিতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসারে সদস্যগন নির্বাচিত হন । লোকসভার 'কার্যক্রম নিয়ম ও কার্যচলন' -এর ৩১০-৩১২ ধারা অনুসারে মূল্যানুমান কমিটির কার্যবলী নির্ধারিত হয় । সরকারী হিসাবে কমিটির সদস্যরা লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় কক্ষ থেকেই নির্বাচিত হন ।কিন্তু মূল্যানুমান কমিটির ৩০ জন সদস্য লোকসভা থেকেই শুধু নির্বাচিত হন । লোকসভার স্পীকার মূল্যানুমান কমিটির সভাপতিকে যোগ করেন । কোন মন্ত্রীকে কখনই এই সভার সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা যায় সা । কারন, মন্ত্রী তার দপ্তরের সপক্ষে মূল্যানুমান কমিটির সংস্যদের প্রভাবিত করতে পারেন । সংসদের স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রতিবছর এক তৃতীয়াংশ বা ১০ জন সদস্য কমিটি থেকে অবসর নেন এবং তাদের জায়গায় নতুন ১০ জন সমানুপাতের নিয়ম অনুসারে নির্বাচিত হন ।
কার্যবলী ঃ মূল্যানুমান কমিটির প্রধান কাজ হল প্রতিটি সরকারী কর্মসূচি ও পরিকল্পনা অর্থ বরাদ্দ বিচার করা এবং যথাযত ব্যয়ের প্রতি নজর রাখা । কমিটি একদিকে সরকারের গৃহীত কর্মসূচিগুলির বাস্তবায়নের দিকে নজর দেয় এবং অন্য দিকে বরাদ্দ অর্থের যথাযত ব্যয় হচ্ছে কিনা অথবা কোনভাবে ব্যয় সংকোচ করে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় কিনা তা বিচার করা । তবে প্রকল্প বা কার্যসূচিকে বানচাল করা বা অর্ধসমাপ্ত করে রাখা এই কমিটির কাজ নয় । অর্থাৎ এই কমিটির কাজ সরকারের প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রনয়ন বা রুপায়ন করা নয় । এই কমিটির কাজ হল কিভাবে মিতব্যয়িতা বা যথার্থ প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করে প্রকল্প বা কার্যসূচিকে সফল করা যায় । সে বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া । সংক্ষেপে মুল্যানুমান কমিটির কাজ হল ঃ
১) সরকারকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া । সরকারের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রশাসনের দক্ষতা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ ও সহয়তা প্রদান করা ।
২)সরকারের অর্থনৈতিক প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করবে অথবা কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা উচিৎ সে বিষয়ে এই কমিটি শুধু পরামর্শ প্রদানের মধ্যেই নিজেকে সিমাবদ্ধ রাখে না । উপরন্ত কার্যকরী ভাবে তার বিকল্পও অনুসন্ধান করে ।
৩) মূল্যায়নমান কমিটির অন্যতম কাজ হল কোন একটি প্রকল্প বা কার্যসূচির জন্য বরাদ্দ অর্থের যৌক্তিকতা বিচার করার পাশাপাশি প্রকল্পের জন্য ব্যয় বরাদ্দ সীমা নির্ধারন করা ।
৪) কিভাবে কোন একটি প্রকল্পের মূল্যানুমান নির্ধারন করতে হবে সে ব্যাপারে মূল্যানুমান কমিটি সংসদকে পরামর্শ প্রদান করে ।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্র-সম্পর্কিত গান্ধির ধারনা কি ছিল ।
উঃ ভারতের রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮)স্থান অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ কারন,ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির এক বিশেষ পর্বে এই চিন্তা ভারতের রাজনৈতিক ভবিষৎ এর ভিত্তিরুপ উদগত হয়েছিল । ভারতীয় হয়েও তিনি ছিলেন, Carl Harth এর ভাষায় 'the type of the cirilized abd humanized man ' তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ছিল অসংবদ্ধ,বিক্ষিপ্ত;তা ছিল ভারতের অর্থ সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় পরিপেক্ষিত -সংস্কৃতি; অথচ নৈতিক , নৈবক্তিক , । তার নিজের স্বর্থহীন স্বীকারোক্তি হয় ঃ 'There is no such as 'Ghandhism' and I do not what to leave any doctrine after me .... I have simple tried in me own way to apply the basic thuths to our daily life and problems' । এই দৃষ্টিভঙ্গিই তার রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারনার ক্ষেত্রকে কর্ষন করেছিল ।
গান্ধীর চিন্তার কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য ছিল ঃ সত্য ও অহিংসা তাই বলপ্রয়োগ (Force) তথা হিংসা(violence) যে রাষ্ট্রের ভিত্তি, তাকে তিনি সম্পূর্ন অস্বকিার করেছিলেন ।রাষ্ট্র তার দৃষ্টিতে একটি কৃতিম , অমানবিক নিষ্পেষনমূলক যন্ত্র, তার ভাষায় ঃ 'The state represents violence in a concentrated and organized form ... the state is a soulless machine ' তাই রবীন্দ্রনাথ বা অরবিন্দ ঘোষের মতোই, তিনিও তথাকথিত ইউরোপিয় আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে, তা উদার গনতান্ত্রিক বা মার্কসীয় - যাই হোক না কোন , ব্যক্তির ও সামাজিক জীবনের পরিপন্থি বিষয় রুপে দেখিছেন । রাষ্ট্রের চরম , নিরঙ্কশ বলপ্রয়োগ ও হিংসার বৈধ ক্ষমতা ব্যক্তির তথা সমাজের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক ও অমঙ্গলকারী শর্ত ; রাষ্ট্র হল একটি '' । তাই আদর্শ সমাজ হবে রাষ্ট্রবিহীন ,তথা বল প্রয়োগ ও হিংসা থেকে মুক্ত যেখানে ব্যক্তির নৈতিক- নাসাজিক ও আধ্যাত্মি সত্তার পূর্নাঙ্গ ও সামূহিক বিকাশ ঘটা সম্ভবপর ।

অর্থাৎ, গান্ধীর মতে, রাষ্ট্র শয়তানের প্রতীক, কারন তা অসভ্য ও হিংসার উপর স্থাপন; তাই গান্ধীর রাষ্ট্র- সংক্রান্ত ধারনাটি 'Negative' । সুতারাং যে রাষ্ট্রবিহীন সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন গান্ধী , তা ছিল সৈরাজ্যবাদী ধারনা । রাষ্ট্রের বিকল্প হল - সত্য ও অহিংসা - ভিত্তিক একটি নৈরাজ্যবাদী সমাজ । এটিই ছিল তার ' পরম রাজনৈতিক পক্ষ' ।

এই রাষ্ট্র-বিকল্প সমাজের নিউক্লিয়াস হল তার মতে ' সমাজস্থ নৈতিক ব্যক্তি '; তাই, তিনি পশ্চিমী রাষ্ট্রকৃত 'greatest happiness of the greatest number' এর তত্ত্বের পরিবর্তে 'সর্বোদয়' (greatest good for all) গুরুত্বদান করেছিলেন । এর থেকে দুটি তাৎপয্য প্রকাশ পাই ঃ

ক) ব্যক্তি হর সমাজের প্রথমিক একক ঃ

খ) রাষ্ট্র হল নিছুক একটি উপায় (a means), স্বয়ং কোন লক্ষ্য (end-in itself) নয় । তাই, 'হরিজন' পত্রিকায় (১৯৪০) রাষ্ট্রের পরিবর্তে একধরনের ' সুশৃঙ্খল নৈরাজ্য' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ঘোষনা করেছিলেন । তবে, বিভিন্ন সময়ে তিনি বিশুদ্ধ নৈতিক কতৃত্বের উপর স্থাপিত গনসমাজভৌমিত্ব ভিত্তিক ' জ্ঞানদীপ্ত নৈরাজ্য '(Enlightened Anarchy) কে তার আদর্শ ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি বর্ননা করেছিলেন অ এই ধারনা হল তার ' রামরাজ্য' এর ধারনা । এই কারনেই ডঃ গোপিনাথ ধাওয়ান গান্ধীকে বলেছেন 'philosophical anarchist'।

গান্ধী বিশেষত্ব বুদ্ধদেব ভট্টচার্য 'Evolution of the political philosophy of Gandhi' দেখিয়েছেন যে, গান্ধীর সত্ত্বার মধ্যে'দুই গান্ধী ' এর অস্তিত্ব বর্তমান ছিল ।একজন আদর্শবাদী দার্শনিক অন্যজন ' বাস্তববাদী দার্শনিক' তাই গান্ধীর রাষ্ট্রতত্ত্ব সমকালীন ভারতের বাস্তব অবস্থার পেক্ষিতে উৎসারিত হলেও, তা শেষ পর্যন্ত আদর্শবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রকৃতিতে পর্যবসিত হয় ; তাই তিনি ঘোষনা করেছেন ঃ ' (the state is)not an end in itself but as one of the means of enabling people to better condition in every department of life' ।

প্রশ্ন ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের 'উদারনীতিবাদ/আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ' ।

উঃ - ' আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পাঠের ক্ষেত্রে প্রথম সর্বপেক্ষা জনপ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ' উদারনীতিবাদ বা আদর্শবাদ দৃষ্টিভঙ্গি' (Idealist Approach) ,যা ঐতিহাসিকভাবে ' বাস্তববাদ' (Realism) ও আচরনবাদ (Behaviouralism) এর পরবর্তী ছিল । ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী কালে রয অবিরাম যুদ্ধের পরিবেশ ও যুদ্ধ - একধারে কার্যকর ছিল, ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্তর্ভূক্ত উন্নতির সঙ্গে তা আরও ভয়াবহ রুপ লাভ করে । তাই, এই অশান্ত,ভয়াবহ আন্তর্জাতিক অবস্থাকে শান্তিপূর্ন করে তোলার অভীপ্সায় আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এর উদ্ভব ঘটে ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর (১৯১৪-১৮) ভয়ঙ্কর অভিঘাতে, ধ্বংস ও দুর্দাশার থেকে মুক্তির পথ- সন্ধান করতে গিয়ে Woodrow Wildon -তার 'Fourteen Point Programme' - সর্বপ্রথম যে দৃষ্টিভঙ্গি দান করেন, তাই হল আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি । প্রথম মহাযুদ্ধ ছিল Total war ; এই যুদ্ধে সর্বত্মকবাদী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে তথাকথিত উদারনীতিবাদী রাষ্ট্রগুলিও, যেমন ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন অংশ গ্রহন করেছিল । ফলে ব্রিটেন -ফ্রান্সের জোট ও শক্তি সাম্যের নীতিও ব্যর্থ হয় । এই অবস্থায় বিশ্ব শক্তি প্রচেষ্টার জন্য wilson এই দৃষ্টিভঙ্গি ও তার ধারনাকে প্রকাশ করেছিলেন ।

১৯২০-১৯৩০ এর দশকে আর্দশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশিত হয় । এই মূল প্রত্যয় ছিল ঃ

১)ব্যক্তি, তথা মানব প্রকৃতি স্বভাবত ভাল (good); তা ইতিবাচক ; মানুষ ভালো বলেই সমাজ গঠিত হয়েছে এবং সমাজের প্রগতি তরান্বিত হয়েছে ।

২)মানব সমাজ তাই সহযোপিতামূলক ।

৩) কিন্তু, কিছু মন্দ(bad) সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির মধ্যে অশুভ প্রবনতা সৃষ্টি করে । এই মন্দ প্রতিষ্ঠানগুলিই বিশ্বের সংঘাত ও যুদ্ধের কারন । নিছুক ব্যক্তি এর জন্য দায়ী নয় । এখানে মন্দ প্রতিষ্ঠান বলতে wilson - গনতন্ত্র নয়, এমন শাসন ববস্থাকে বুঝিয়েছেন ।

এমন গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল ভালো ; মন্দ হল তার বিপরীত অর্থৎ ধৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা । এই ভালো গনতান্ত্র হল মুলত মার্কিন মডেল গনতন্ত্র । এই গনতন্ত্র উদারনীতিবাদী ও পুঁজিবাদী বিশ্ব- অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত । wilson এর এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, যে রাষ্ট্র এই কাঠামোর অর্ন্তভূক্ত নয় , সেই যুদ্ধের কারন ।

wilson এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ' যুদ্ধ বন্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি' এর ধারনা থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ন ব্যবস্থাকে পেশ করেছেন -

ক) বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক Immanuel Kant এর The porpetual peace এর প্রদ্ধতিকে গ্রহন করে দেখিয়েছেন যে, বিশ্ব শান্তি ধীরে ধীরে জাতীয় থেকে আন্তর্জতিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত হবে ।যা হবে মানব সভ্যতার 'যুক্তির' (Reason) প্রকাশ । তবে, এই শান্তিকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন আন্তর্জতিক আইন ও একটি সর্বগ্রাহ্য 'আন্তর্জতিক অতিসংস্থার ; । এই এখানেই ১৯১৯ খ্রীঃ 'League of Nations' প্রতিষ্ঠার আন্তরিক উদ্দ্যোগ গহন করেছিলেন ।

খ) wilson দেখিছেন যে , গনতন্ত্রে নির্বচিত সরকার নেতৃবর্গ যেহেতু জনগনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে না । তাই গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আদর্শের বিশ্বব্যাপি প্রচার -প্রসার যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা কার্যকর প্রতিষেবক ।

সুতারাং , আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যে ধারনাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, তার কিছু ত্রুটি ছিল ঃ
১) এই দৃষ্টিভঙ্গি ধরে নিয়েছিল যে, বিশ্ব ব্যবস্থা সৈরাঞ্জমূলক (Anarchical) তাই একটি অতি সংস্থা একে নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রয়োজন । কিন্তু এই অতি সংস্থা League of Nations- মাত্র ২০ বছর (১৯১৯-৩৯) সক্রিয় থাকতে পেরেছিলে ।
২) আন্তর্জতিক আইনের কথা স্বীকার করে এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ আন্তর্জতিক জাতি রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতাকেই স্বীকার করে নিয়েছে ।
৩) ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি, এই মতবাদে মার্কিন বাঁচের গনতন্ত্রকে গ্রহনের যে ধারনা হয়েছে, তা ছিল মূল ' মার্কিন আর্কিপত্যের গোপন নীতি'র (The policy of concealed Amarican Hegemony) প্রকাশ ।
৪) ১৯১৭ খ্রীঃ বিশ্বের ১/৭ অংশে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে 'আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি' মোকাবিলা করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল ।
বস্তুত, উদারনীতিবাদ/ আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একটি কর্তৃত্বমূলক মার্কিন উদ্ভাবন যা বিশ্ব জঙ্গলের অবাধ্য (স্বৈরতান্ত্রিক) রাষ্ট্রগুলিকে আন্তর্জাতিক আইনের চিড়িয়ামানাম আবদ্ধ করতে চেয়েছিল । তাই গনতান্ত্রিকে কেন্দ্র করে স্থাপিত করে wilson ঘোষনা করেছিলেন যে -'We fight thus for the ultimate peace of the world... The world must be made safe for democracy ' । কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিছুক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবিহীন বিমূর্ত অনুমানের সমষ্টি (collecting of conictures); তাই , বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই এই মতকে মন্তব্য করে আত্মপ্রচেষ্টা করতে সমর্থ্য হয়েছিল । প্রশ্ন ঃ আন্তর্জাতিক সমাজে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে আলোচনা কর ।
উঃ- ১৯৯০ এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সমাজের ভারসাম্য একাধিক কারনে বিঘ্নিত হয়েছে ; সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পতন ও বিযুক্তিকরন, তথা মতাদর্শ (সমাজতান্ত্রিক) ও ইতিহাসের সমাপ্তি (সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা) , একমেরু থেকে বহুমেরু বিশ্বের উত্থান তৃতয়ি বিশ্বের উপর 'নয়া উপনেশবাদী শোষন ' , আঞ্চলিকতাকাদের বহুল বিস্তার লিঙ্গ, সমকামী,মানবতাবাদী, বর্নবাদ বিরোধী,ধর্মী মৌলবাদ বিরোধী একাধীক ও অসংখ্য সামাজিক আন্দোলনের বিকাশ ও প্রভাব বিজ্ঞান প্রযুক্তির অসাধারন উন্নতি ও গনমাধ্যমের প্রসার ও সর্বপরি বিশ্বয়ন - বিগত প্রায় দুশতকে বিশ্ব সমাজ ও ব্যবস্থাকে বহু মাত্রিক রুপ প্রদান করেছে , যেমন চরম বৈশ্বিক ক্ষমতার কেন্দ্র কোন একটি Phenomeonon -এর অন্তর্ভূক্ত নয় । এই বিশ্ব ব্যবস্থারই ও তার অন্তর্গত ক্ষমতার রুপেই চর্মকপ্রদ প্রকাশ হল ঃ সন্ত্রাসবাদ ।
তান্ত্রিকভাবে সন্ত্রাসবাদ বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন ক্ষুদ্র ও গুপ্ত গোষ্ঠীর সংগঠিত হিংসাত্মক রাজনৈতিক প্রতিবাদ। সন্ত্রাসবাদের ঐতিহাসিক উৎস 'ফরাসী বিপ্লব' হলেও আন্তর্জাতিক সমাজে সন্ত্রাসবাদ সাম্প্রতিককালে স্বতন্ত্রে অর্থকে প্রকাশ করে ।
১) ক্ষুদ্র ও গুপ্ত গোষ্ঠীর কার্যক্রম ও তার প্রয়োগ সুপরিকল্পিত সুনির্দেশিত ও সচেতন ।
২) এর মূল লক্ষ হল রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের আঘাত করা । তবে কোন সামাজিক সংগঠন বা নাগরিকরাও এই আঘাতের লক্ষ্য হতে পারেন ।
৩) সন্ত্রাসবাদ সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের থেকে পৃথক; কারন এদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ।
সুতারাং সন্ত্রাসবাদ আন্তর্জাতিক শান্তিকে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে বিঘ্নিত করে । এর কতকগুলি দিক বর্তমান ঃ
ক)'ওয়েস্টফলিয়ার শান্তি চুক্তির' প্রায় ৪৫০ বছর পরে, জাতি রাষ্ট্রের নিশ্চিত কাঠামো ও সার্বভৌম ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেছে সন্ত্রাসবাদ । ১১/০৯ এ মার্কিন টুইন টাওয়ার্স আক্রমন করা ২৬/১১মুম্বাই হামলা, রাষ্ট্রের চরমতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে ।
খ)'সন্ত্রাসবাদ' বৃহৎ ও ক্ষুদ্র - সব রাষ্ট্রেরই অভ্রান্তরীন ও বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করেছে । এর পূর্বে বৃহৎ রাষ্ট্রের মূল নীতি ছিল আধিপত্যবাদ, নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের এই অধিপত্যকে অতিক্রম করা ; অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ- প্রতিরোধ সব রাষ্ট্রেরই মৌলিক জাতীয় স্বার্থ হয়ে উঠেছে ।
গ)এর ফলস্বরুপ গত দশ বছরে সন্ত্রাসবাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে 'cement-element' এর ভূমিকা পরোক্ষ পালন করেছে । বিভিন্ন রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদ বিরোধীতার কারনে ঐক্যবদ্ধ ও নির্ভরশীল হয়ে পরেছে । দূরত্ব ও বৈরিতা হ্রাস পাচ্ছে । অর্থাৎ পরোক্ষ,সন্ত্রাসবাদ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে ।
ঘ) যৌথ নিরাপত্তা -এর ধ্রপদি ধারনার পরিবর্তন ঘটিয়েছে সন্ত্রাসবাদ ; যৌথ সামরিক অভিযান কোন দূরন্ত রাষ্ট্রকে দমনের জন্য ১৯৮০ এর দশকেও প্রাসঙ্গিক ছিল ; কিন্তু এখন এই আক্রমনের লক্ষ্য হল একটি অনির্দিষ্ট, আপেক্ষিক ও গতিশীল অ-রাষ্ট্রিক একক , যার নাম সন্ত্রাসবাদ । তাই প্রচরিত হয়েছে নতুন ধরনা ধারনা ঃ 'selefive counter-rerrorism '
তার 'The clash of civilizations and the remaking of the world order' (১৯৯৬) গ্রন্থে samuel P. Huntingtonশীতল যুদ্ধ উত্তর বিশ্বকে তথাকথিত শ্রেনি সংঘাতহীন এক ব্যবস্থা হিসাবে দেখিয়েছেন, যেখানে মতাদর্শ কেন্দ্রচ্যুত হয়েছে , এই শূন্যস্থানে আত্মপ্রকাশ করেছে ' সভ্যতার সঙ্গে অভ্যতার অবদমিত সংঘর্ষ, যেখানে সভ্যতা হল সুশৃঙ্খল বিশ্বব্যবস্থা ও অসভ্যতার বাহক হল ' সন্ত্রাসবাদ' ।
শীতল যুদ্ধ পর্বে সন্ত্রাসবাদ ছিল স্থানিক, যেমন শ্রীলঙ্কায় , নেপালে বা চেচনিয়াতে ক্রমে তা আঞ্চলিক হয়ে ওঠে , প্রতিবেশি রাষ্ট্র বা বহিঃশক্তির মদতে ভারতে তথা SAARC ভুক্ত রাষ্ট্রগুলিতে বিকাশ ও প্রভাব বৃদ্ধি করেছ । কিন্তু, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পতনের পরেই এই সন্ত্রাসবাদ ক্রমে বৈশ্বিক হযে ওঠে ও এর চরিত্র পশ্চিমী উদারনীতিবাদ বিরোধী হয়ে ওঠে, যার চরম অভিব্যক্তি হল '১১/

৯ এর ঘটনা । এবং সন্ত্রাসবাদের পরে স্বয়ং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে । রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের যুদ্ধের বদলে সন্ত্রাসবাদী ও তাদের আশ্রয়দাতা রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে (যেমন - ইরাক) যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট 'National Commission on Terrorism ' ও নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তালিকা গঠন করেছে । কিন্তু, সন্ত্রাসবাদ তার রাজনৈতিক লক্ষ্য অবিচল, তারই প্রমান মিলল ২৬/১১/০৮ এর মুম্বাই কান্ডে ।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার ক্ষেত্রে ' রাষ্ট্রসংঘ (UNO) ' বিশেষ ভাবিত , ১৯৯৪ খ্রীঃ রাষ্ট্রসংঘের সাধারন পরিষদ সন্ত্রাসের নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহন করে যে, 'The General Assemble unequivocally condemned all acts of terrorism, as criminal and unjustifiable where ever and whomsoevar committeol '

ঐ প্রস্তাবেরই কার্যবলী বিধানগুলির পঞ্চম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকেই সন্ত্রাসবাদ দমনের কাজটি সনদ ও আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক বাধ্যবাধকতা হিসাবে দেখতে হবে এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের দ্রুত অপসারনে তৎপর হতে হবে । এই সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলি হল ঃ

ক) সমস্ত প্রকার সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের সংগঠন, উস্কানি, সাহায্যদান, অর্থ সরবরাহ, উৎসাহদান এমনকি সহ্য করে যাওয়া থেকে বিরত হওয়া ।

খ) নিজ নিজ ভূখন্ডকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য ব্যবহৃত হতে না দেওয়া ।

গ) সন্ত্রাসমূলক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার, বিচার, শাস্তিদান এবং (বিদেশির ক্ষেত্রে) প্রত্যপর্ন ।

ঘ) এই মর্মে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে অথবা আঞ্চলিক স্তরে বিশেষ চুক্তি সম্পাদান ।

ঙ) আন্তর্জাতিক স্তরে সন্ত্রাসদমনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবারহ ও বিনিময়ের কাজে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সহযোগীতা ।

চ) বিদ্যামান আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলির জাতীয় আইনের মাধ্যমে প্রয়োগের ব্যাপারে সহমত ।

ছ) সন্ত্রাসবাদী সংশব আছে এমন কোন ব্যক্তি আশ্রয়প্রার্থী হলে রাষ্ট্রীয় আশ্রয় (asylum) না দেওয়া এবং উদ্বাস্তুদের আশ্রয় না দেওয়া ।

এরপর ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক (UN Millennium summit) -এর চূড়ান্ত ঘোষনা সমস্ত রকম সন্ত্রাসের দমন ও বিনাশকে জরুরি ভিত্তিতে সমপন্ন করতে হবে । আমেরিকায় ১১ই সেপ্টেম্বর এর দুর্ঘটনায় পরিপেক্ষিতে এ বিষয়ে বিশেষ অধিবেশন বসে এবং সন্ত্রাসদমনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় । ঐ বৈঠকে আরও বিশেষ করে জোর দেওয়া হয় মাদকদ্রব্য ও ছোট অস্ত্রের নিষিদ্ধ চোরাচালানের সঙ্গে সন্ত্রাসের বিশেষ সংযোগের উপর । এই প্রসঙ্গে নিরপত্তা পরিষেদ গৃহিত ১৩৭৩ সংখ্যাক সিদ্ধান্তটি অন্ত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন (২৮ সেপ্টেম্বর,২০০১) সন্ত্রাসের কোন সংজ্ঞা এতে দেওয়া হয়নি কিন্তু সন্ত্রাসের জড়িত হতে পারে এমন সবরকমের গোষ্ঠী বা সংস্থাকে নজরদারী ও শাস্তিদানের আওতায় আনা হয়েছে এবং সদস্য সব রাষ্ট্রকে বলা হয়েছে অপরাধরি শনাক্তকরন, গ্রেপ্তরি, অনুসন্ধান ও ধৃতবন্দীর বিচার বাধ্যতামূলক করার আইন প্রণয়ন করতে ।

প্রশ্ন ঃ পাদুয়রি মার্সিলিয়াসের রাজনৈতিক চিন্তা আলোচনা কর ।

উঃ - গ্রন্থটির তিনটি অংশে, প্রথম অংশে Aristotle এর নীতিসমূহ ও রাজনৈতিক দর্শনের ব্যাখ্যা , দ্বিতীয় অংশে চার্চ , যাজকদের ক্রিয়াকলাপ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা এবং তৃতীয় অংশে প্রথম দুটি অংশে থেকে ৪২ টি সিদ্ধান্তকে সূত্রবদ্ধ করেছেন । 'Defensor Pacis' বা 'The defender of peace' (১৩২৪) গ্রন্থে 'Marsilius of padua' প্রচলিত মধ্যযুগীয় চিন্তার থেকে পৃথক রাষ্ট্রতত্ত্ব নির্মান করেছিলেন । এই গ্রন্থটিকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন 'Bavaria ' এর শাসক hewis কে । নিব মধ্যযুগে এর রাজনৈতিক দর্শনের তিনটি গুরুত্বপূর্ন পরিপরক প্রবাহ ছিল ঃ

১) Aristotle এর teleopgical thinking (ব্যাখ্যা) ।
২) ptolemy এর বিশ্বকেন্দ্রিক ব্রক্ষান্ডের ধারনা (ব্যাখ্যা)।
৩) St. Aagusting এর খ্রীষ্টধর্মীয় তত্ত্ব (ব্যাখ্যা) ।

Masilius এর রাজনৈতিক তত্ত্বগুলির বিপরীত বিন্দুতে স্থাপিত -

ক)রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারনা ঃ রাষ্ট্র হল organium। রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকবে যদি তার অংশ বিভাগগুরির সঠিকভাবে কার্য সম্পূর্ন করে । অন্যথায় , জীবদেহের মতো তা অসুস্থ্য হয়ে পড়বে । সুস্থ্য মানুষের মতো রাষ্ট্রকেও কার্যকরী হতে হবে । ব্যক্তির জীবন যাপন রাষ্ট্রের মধ্যেই মহত্ব লাভ করে ।

এই মহত্ব দুই প্রকারের -

বর্তমান জীবনের মহত্ব ও ভবিষৎ জীবনের মহত্ব ।

স্থায়ী , সুদক্ষ সরকার প্রথম মহত্ব লাভ করতে ব্যক্তিকে সাহায্য করবে । ধর্ম দ্বিতীয় প্রকার মহত্বকে অর্জনের পথ প্রশস্ত করবে । তাই, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের পূর্নতার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন । তাই যেখানে ব্যক্তির ক্ষুত্র স্বার্থের পরিবর্তে সামাজিক কল্যান বাস্তবায়িত হয় ।

Plato এর ন্যায় রাষ্ট্রের শ্রেনি বিভাজনের মতোই Marsilius দেখিয়েছেন যে , বিভিন্ন শ্রেনির পারস্পরিক সক্রিয় ভূমিকার দ্বারাই রাষ্ট্র সফলভাবে পরিচালিত হয় । যেমন উৎপাদক শ্রেনি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ করবেন । কিন্তু , রাষ্ট্রের শান্তি বিঘ্নিত হয় 'যাজক শ্রেনী ' এর অজ্ঞতার কারনে । যাজকরা প্রকৃত কর্তব্য সম্পর্কে অচেতন ও ফলে তারা লোকায়ত সমস্যার হস্তক্ষেপ করে ফেলেন । এটা শাষকের দায়িত্ব । এবং পোপতন্ত্রের কর্তব্য হল ধর্মগ্রন্থকে অনুসারন করে পরজগতের সুম ও শান্তির বিষয়ে মানুষকে পরিচালনা করে । অর্থাৎ ধর্ম Marsilius এর তত্ত্বে অতিলৌকিক বিক্ষুত বিষয় । তাই রাষ্ট্রের অন্যান্য শ্রেনির মতোই নির্দিষ্ট কার্যই শুধু পালন করবেন । ও রাষ্ট্র ও শাসক এই শ্রেনিকে নিয়ন্ত্রন করবেন । তার ভাশায় ঃ 'The church is the part of the secular state in every respect in the temporal matters' ।

তিনি বিশ্বাস করেন যে , ঈশ্বরের পরিচালনা মতে পরলোকে মানুষের সুখ শান্তির ব্যবস্থা করবেন চার্চ । এক্ষেত্রে চার্চ বলতে তিনি পোপতন্ত্রের নিয়ন্ত্রিত একটি বিশেষ সংস্থাকে বোঝায় নি । চার্চ হল তাঁর দৃষ্টিতে , ঈশ্বরের বিশ্বাসি মানুষের একটি ধারনা সংস্থা । তাই চার্চর একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে কেন্দ্রভূত হতে পারে না । তাই তিনি একটি সাধারন পরিষদ (General council) গঠনের সুপারিশ করেছেন । এখানে, সমস্ত খ্রীষ্টধর্মীয় বিশ্বাসী মানুষ তাদের প্রতিনিধিরা সবেত হবেন । পোপ ও জাযকরা হবেন এই পরিষদের একটি অংশ মাত্র ।

সাধারন পরিষদ কার্য নির্বাহ করবে ভোটের মাধ্যমে ; এর প্রধান দায়ীত্ব হল -

১) ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যাকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা ।

২) সমাজচ্যুতির রায় জারি করা ।

৩) ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন করা ।

৪) চার্চের অভ্যন্তরীন প্রশাসনকে পরিচালনা করা ।

সুতারাং চার্চের যাবতীয় কার্যভার গ্রহন করবে সাধারন পারষদ ও পোপতন্ত্রো এর অধীন হবে ।

তিনি রাষ্ট্র ও চার্চের সম্পর্কে সম্পূর্ন পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন ;

১) রাষ্ট্রের বহুবিধ কার্যবলীর মধ্যে ধর্মীয় কার্য অন্যতম । এই ধর্মীয় কার্য পালন করত যাজক শ্রেনি রাষ্ট্রীয় কর্মচারী হিসাবে ভূমিকা পালন করবেন ও রাষ্ট্রের আইন ও বিধিনিষেদ তাদের উপরেও সমভাবে কার্যকর থাকবে ।

২) চার্চের বলপ্রয়োগের ক্ষমতা নেই । যাজক বা সাধারন ব্যক্তি কাউকেই শাস্তি প্রদানের অধিকার চার্চের নেই । আছে এদমাত্র রাষ্ট্রের ।

৩) চার্চকে রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা থেকে বিরত রেখেছেন Marsilius । রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে চার্চের আকাঙ্খাই দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার উৎস যা রাষ্ট্রকে দুর্বল করে ।

তাৎপর্য ঃ

১) Aristotle এর পর সর্বাপেক্ষা বাস্তববাদী তাত্ত্বিক ।

২) রাজনীতিকে ধর্ম থেকে মুক্ত করেন ।

৩) ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের উৎপাদনের তাত্ত্বিক ছিলেন তিনি ।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে জন লকের (John Locke) সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনা কর ।

উঃ - ইংল্যান্ডের হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদের তাত্ত্বিক হলেন John Locke।

ছিলেন হবসের উত্তরসূরী কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন হবসের চিন্তা থেকে ভিন্ন । এর সামাজিক চুক্তি মতবাদছিল অনেক বেশি গনতান্ত্রিক এবং অভিজ্ঞতাবাদের উপর নির্ভরশীল ।

হবসের মতোই Locke এর সামগ্রীক রাজনৈতিক তত্ত্ব দুটি স্তরে বিভক্ত ও তা আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে উদ্ভূত হয় তা ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী ।

ক) Locke এর প্রকৃত রাজ্য ছিল হবসের প্রকৃতিক রাজ্যের বিপরীত । এই প্রকৃত রাজ্য শৃঙ্খলা শান্তি ছিল । একটি ছিল প্রাক রাজনৈতিক সমাজ ।

খ) Locke এর মতে স্বাভাবিক আইন দ্বারা পরিচারিত ঃ স্বাভাবিক আইনকে লক বুঝিয়েছেন যে , প্রকৃতির রাজ্য প্রত্যেক ব্যক্তির যুক্তি দ্বারা পরিচালিত ফলে এখানে হবসের প্রকৃতির রাজ্যের মত বিশৃঙ্খল, নৈরাজ্য , ও সংঘাত ছিল না । মানুষ তাদের অধিকার ভোগ করত এবঙ প্রত্যেকের সম্পত্তি ও জীবনে পূর্ন অধিকার ছিল । অর্থাৎ লক এর প্রকৃতি রাজ্য হবসের প্রকৃতির রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি সুসংহত শান্তিপূর্ন ছিল ।

কিন্তু , তিনটি কারনে লক প্রকৃতি রাজ্য আদিম ছিল না ঃ

১) যে স্বাভাবিক আইনের দ্বারা প্রকৃত রাজ্য চালিত হত সেই সম্পর্কে মানুষের ধারনা ছিল অস্পষ্ঠ । ফলে ভুল বসত মানুষ এতে অন্যের হস্তক্ষেপ করে ফেলত ।

২) প্রকৃতির রাজ্য স্বাভাবিক আইন ব্যাখ্যা করা কোন সর্বজলীন কতৃপক্ষ ছিল না । এবং

৩) প্রকৃতির রাজ্যে স্বাভাবিক আইন প্রয়োগ কোন উচ্চতর সংস্থা ছিল না ।

খ) সুতারাং প্রকৃতি রাজ্যের মানুষ নিজেদের জীবন ও সম্পাত্তিকে সুরক্ষিত করতে চুক্তি সম্পদন করে । লক এর মতে এই চুক্তি আবার দুটি ভাগে বিভক্ত ।
ক) প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতেকের সঙ্গে চুক্তি করে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তিকে বাইরের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে । যার কাছে ব্যক্তি মানুষেরা স্বাভাবিক আইন কার্যকর ক্ষমতা করে ।
খ) রাজনীতিক সমাজকে শক্তিশালী ও স্থায়ী করতে দ্বিতীয় চুক্তি ঘটে । যার ফলে সৃষ্টি হয় সরকার..... । প্রথম টি হল সামাজিক চুক্তি এবং দ্বিতীয়টি হল সরকার চুক্তি । এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল যে সরকার রাষ্ট্রের 'অছি' রুপে তার ভূমিকা পালন করেন ।

লক এর সামাজিক চুক্তির বৈশিষ্ট ঃ
১) প্রকৃতির রাজ্যে ব্যক্তি সম্পত্তি বিত্তিতে সমাজ গঠিত হলেও প্রশাসন পরিচালিত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে ।
২) জনগন অকারনে চুক্তি প্রত্যাহার করতে পারবে না । কারন তা করলে মানুষ আবার প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাবে ।
৩) মানুষ চুক্তি করে সমাজ গঠনের পরেও .... অভ্যহত থাকবে , সেই সম্পর্কে কিছু বলেননি কিন্তু লক এক্ষেত্রে দেখিয়েছেন যে , পরবর্তী প্রজন্ম চুক্তিকে বাধ্যতামূলক ভাবে মানবে । কারন চুক্তির শর্ত অমান্য করার অর্থ হল শিশুকে রাষ্ট্রহীন করা । সন্তান তার পিতা মাতার তৈরী রাষ্ট্রের মধ্যে জন্ম গ্রহন করবে , চাকরিতে যোগ দেবে ,অর্থাৎ ধরে নিতে হবে যে চুক্তির প্রতি পরের জন্মের পরক্ষ সম্মাতি আছে ।

উপসংহার ঃ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে লক এর এই তত্ত্ব দুটি চুক্তিকে প্রতিফলিত করে । এই কারনে লক এর প্রধান গ্রন্থের নাম '' অর্থাৎ তিনি এক্ষেত্রে যে কেবল মাত্র সংবিধানকে সরকারের তত্ত্ব দান কররেন তা নয় , একসঙ্গে সম্মতি ও সম্পত্তি এই দুই উপাদানকে গ্রহন করার ফলে উদারনীতিবাদের জনক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে । তার তত্ত্ব পরবর্তী কালে রুশোর সাধারন ইচ্ছার তত্ত্বকে প্রভাবিত করেছিল । কিন্তু যা ছিল হবসের চরম রাষ্ট্রতত্ত্বের থেকে সম্পূর্ন পৃথক । এই কারনেই রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাস লক এর সামাজিক চুক্তি অসাধারন ।

প্রশ্ন ঃ সামাজিক চুক্তি সম্পর্কে টমাস হবস এর তত্ত্ব আলোচনা কর ।
উঃ - ১৫৮৮ খ্রীঃ ইংল্যান্ডের টমাস হবস এর জন্ম হয় । প্রাচীন ও মধ্যযুগে সামাজিক চুক্তি মতবাদ থাকলেও আধুনিক সামাজিক চুক্তি মতবাদের পথিকৃৎ হলেন টমাস হবস । হকসের সামাজিক চুক্তি মতবাদ হল রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত তত্ত্ব । তাঁর বিখ্যাত ()১৬৫১ খ্রী ঃ) গ্রন্থে তিনি তার সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রধান করেছিলেন ।

হবসের সামগ্রীক তত্ত্বের ভিত্তি করে রাজনীতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সূত্র গঠন করা । সামাজিক চুক্তি মতবাদের ক্ষেত্রও তিনি এই ধারনাকেই প্রয়োগ করে ছিলেন ।
ক) প্রকৃতির রাজ্য ঃ হবস রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কিত রয সামাজিক চুক্তি প্রধান করেছিলেন তা দুটি প্রধান স্তরে বিন্যাস্ত । প্রকৃতির জন্য হল তার প্রথম স্তর । হবস প্রকৃতির রাজ্যে বর্ণনায় বলেছেন প্রকৃতির রাজ্যের অবস্থিত ব্যক্তিদের দৈহিক ও মানসিক সামর্থ সমান । কিন্তু পরোক্ষ রাজ্যে কোন শিল্প, সংস্কৃতি,জ্ঞান শিল্পকলা এমনকি সময়ের ধারনা পর্যন্ত নেই । অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে কোন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি ।

আবার যেহেতু প্রকৃতি রাজ্যে প্রত্যেকের শক্তি সামর্থ সমান এবং ..আইনি কতৃপক্ষ নেই । তাই প্রকৃতি রাজ্য একটি নৈরাজ্যপূর্ন, সঙঘাতপূর্ন,বিশৃঙ্খলা অবস্থা সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি একে অন্যের সঙ্গে অবিরাম সংঘাতে লিপ্ত । অর্থাৎ হবসের ভাষায় ' নিঃসঙ্গ দীন ' ।
খ) সামজিক চুক্তি ঃ প্রকৃতির রাজ্যে এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে ব্যক্তিরা সামাজিক চুক্তি সম্পাদান করেন । হবস বলেছেন , প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদান করে এবং তাদের অধিকার ও স্বাধীন অংশ দান করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদের কাছে চরম ক্ষমতা তুলে দেয় । অর্থাৎ চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিরা প্রকৃতির রাজ্য থেকে রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্র গঠন করে ও সার্বভৌম ক্ষমতার সৃষ্টি করে ।
সামাজিক চুক্তির বৈশিষ্ট সমূহ ঃ
১) চুক্তি সম্পাদান করে একক ভাবে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি সমষ্ঠি , জনগন বা প্রজারা নয় ।
২) সার্বভৌম নিজ চুক্তিকে অংশ গ্রহন করেন নি । বরং সার্বভৌমের সৃষ্ঠি হয়েছে চুক্তির পরে এবং চুক্তির ফল হিসাবে । সুতারাং সার্বভৌম চুক্তির উর্ধ্বে ।
৩) সার্বভৌমের ক্ষমতা সার্বজনীন চরম ও নিরঃঙ্কুস ।
৪) সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার কারন সমূহ যেহেতু সংখ্যা গরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠান করা , তাই সংখ্যা লঘুরা কোনভাবেই বা সার্বভৌমের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারবে না । এবং
৫) চুক্তির উদ্দেশ্য যেহেতু শান্তি এবং আত্মরক্ষা তাই চুক্তিতে অব্যাহত রাখা চুক্তির অন্যতম প্রধান শান্তি ও বৈশিষ্ট্য ।